করে দেখ

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

করে দেখ

(তিন খণ্ড একত্রে)

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম অখণ্ড সংস্করণ :
—ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭
—মাঘ ১৩৯৩

প্রকাশক :
সুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ :
অজয় গুপ্ত

মুদ্রাকর :
তাপস হাটই
নিউ তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৬ বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

তিনখণ্ড একত্রে
অখণ্ড সংস্করণের

দাম : ২০ টাকা

এই লেখকের অন্যান্য বই

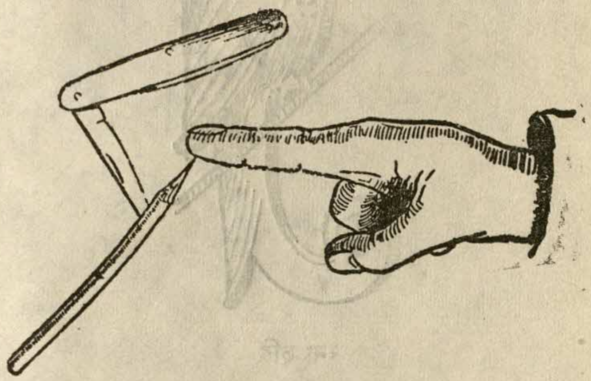
বাংলার কীটপতঙ্গ
(রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কারপ্রাপ্ত)
করে দেখ (২য়)
করে দেখ (৩য়)
গোপালচন্দ্র অমনিবাস

সূচীপত্র

ব্যালেন্সিং-এর খেলা

১.

সরু ডগার উপর একটা লম্বা পেন্সিলকে দাঁড় করিয়ে রাখতে পার কি? চেষ্টা করে দেখো—কিছুতেই পারবে না; কিন্তু সমকোণে খোলা (সোজা করে খুলবে না) একটি ছুরির ফলাকে পেন্সিলের ডগার কাছে বিঁধিয়ে দিলেই দেখবে—পেন্সিলটা একটু হেলানোভাবে



১নং ছবি

পেন্সিলটা আঙ্গুলের ডগায় হেলানোভাবে দাঁড়িয়ে আছে

যে কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে। ছুরিটাকে পেন্সিলের গায়ে কিভাবে কোথায় বিঁধতে হবে, এক নম্বরের ছবি দেখলেই পরিষ্কার বুঝতে পারবে।

২.

পাত্‌লা একখানা কাঠের উপর পেন্সিল দিয়ে দু-নম্বরের ছবিটির মত করে একটি টিয়াপাখীর ছবি এঁকে নাও। তারপর বাটালি দিয়েই

হোক, কি সরু করাত (ফ্রেট-স দিয়ে সহজেই কাটা যায়) দিয়েই হোক, পেন্সিলের দাগে দাগে পাখীটিকে কেটে নাও। তুলি দিয়ে রং করে নিলে দেখতে বেশ সুদৃশ্য হবে। লেজের শেষ প্রান্তে বেশ



২নং ছবি

ব্যালেন্স-করা কাঠের পাখী

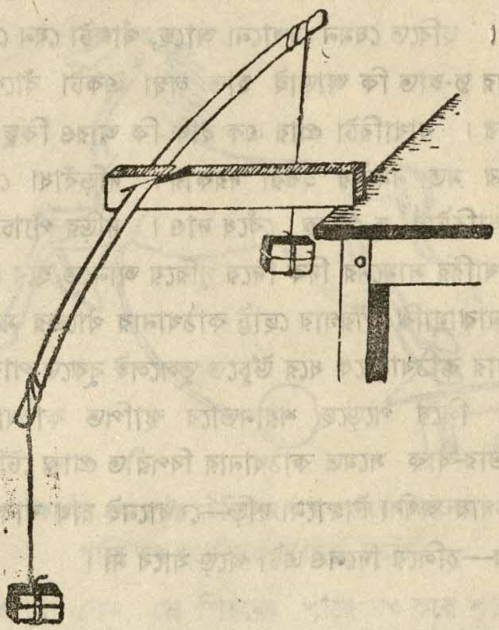
বড় একটা ছিদ্র করে তার মধ্যে বেশ বড় পুরু একখণ্ড সীসার চাক্‌তি পরিয়ে দাও। দেখবে—পাখীটাকে সরু তারের উপর বসিয়ে রেখে দোল দিলেও পড়ে যাবে না।

৩

ভার বাঁকের খেলা

বাঁকের ছুদিকে ভারী বোঝা ঝুলিয়ে মোট বইতে তোমরা অনেকেই দেখে থাকবে। কোন কিছুর উপর একটা লাঠি খাড়া করে ধরে ঝুলানো বোঝা সমেত বাঁকটাকে তার উপর ঠিকভাবে বসিয়ে দিলে সেটা দাঁড়িপাল্লার মত ঝুলে থাকবে। কিন্তু লাঠিটাকে ধরে না

রাখলে সেটা যে কোন একদিকে কাৎ হয়ে পড়ে যাবে। সহজ



ভার-বাঁকের ব্যালেন্স

বুদ্ধিতেই এটা তোমরা বুঝতে পার। কিন্তু ৫।৬ ইঞ্চি লম্বা এক টুক্‌রা কাঠকে কোন উঁচু জায়গায় শয়ানভাবে রেখে, ভারী বোঝা সমেত বাঁকটাকে তাতে কৌশলে বসিয়ে দিলে সেটা সেখান থেকেই ঝুলতে থাকবে—বলপ্রয়োগ না করে তাকে ফেলতেই পারবে না। কেমন করে এটা করা যায়, সে কথা বুঝিয়ে বলছি। তোমাদের মধ্যে যারা এই ব্যাপারটার সঙ্গে পরিচিত নও, তারা এতটুকু চেষ্টা করে দেখতে পার।

প্রথমে ছবিখানাকে ভাল করে দেখে নাও। ছোট্ট কাঠখানার সঙ্গে আট্‌কানো একটা ভার-বাঁক শূন্যে ঝুলে আছে। প্রথমে এক

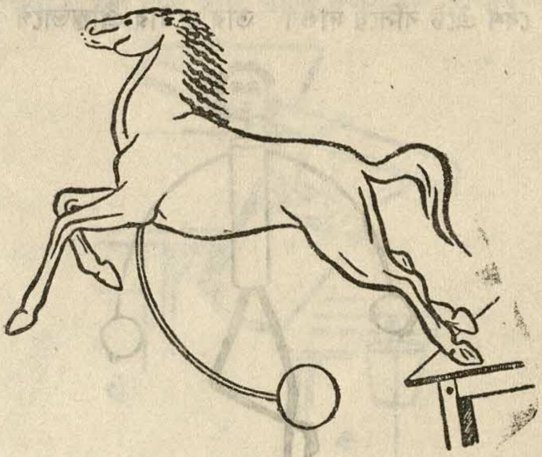
ইঞ্চি চওড়া আধ ইঞ্চি বা তারও কিছু কম পুরু এবং প্রায় ৬ ইঞ্চি লম্বা এক টুক্‌রা কাঠ সংগ্রহ করে তার, একদিকে তেরছাভাবে একটা খাঁজ কেটে নাও। ছবিতে যেমন দেখানো আছে, খাঁজটা যেন সে রকমেরই হয়। এবার দু-হাত কি আড়াই হাত লম্বা একটা বাঁশের বাখারি যোগাড় কর। বাখারিটা প্রায় এক ইঞ্চি কি আরও কিছু বেশী চওড়া এবং স্প্রিঙের মত নমনীয় হওয়া দরকার। দড়িবাঁধা কোন ভারী জিনিস বাখারিটার দু-প্রান্তে বেঁধে দাও। দড়ির প্যাঁচটাকে ছবির মত করে বাখারির সামনের দিক দিয়ে ঘুরিয়ে আনতে হবে। বাখারি-টাকে ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় ছোট্ট কাঠখানার খাঁজের মধ্যে বসিয়ে দাও। এবার কাঠখানাকে ধরে উঁচুতে তুললেই বুঝতে পারবে বাঁকের ভারকেন্দ্রটা গিয়ে পড়েছে শয়ানভাবে স্থাপিত কাঠখানার অপর প্রান্তে। ভার-বাঁক সমেত কাঠখানার বিপরীত প্রান্ত টেবিলের ধারে আঙুলের ডগায় অথবা টাঙ্গানো দড়ি—যেখানেই রাখ বাঁকটা সেখানে ঝুলে থাকবে—দুলিয়ে দিলেও এটা পড়ে যাবে না।

৪.

পরপৃষ্ঠার ছবিখানার মত হাল্কা কাঠ বা টিনের একটা ঘোড়া সংগ্রহ কর। ইস্পাতের একটা সরু তার যোগাড় করে তার এক প্রান্তে বেশ ভারী একটা সীসার বল শক্ত করে এঁটে দাও। ঘোড়াটার ওজনের অনুপাতে সীসার বলটাকে বড় কিংবা ছোট করতে হবে। তারটা ছবির মত বাঁকানো হওয়া চাই। এবার সীসার বল সমেত তারটাকে ঘোড়ার বুকে বেশ শক্ত করে বসিয়ে দাও।

বলটাকে ঘোড়ার বুকে আট্‌কে দিলেই বুঝতে পারবে, শরীরের ভারকেন্দ্র গিয়ে পড়েছে তার পিছনের পায়ের উপর। এই অবস্থায়

—ঘোড়াটাকে পিছনের পায়ের উপর যে কোন সঙ্কীর্ণ জায়গায়



কাঠের ঘোড়াটা টেবিলের এক কোণে পিছনের
পায়ে ভর করে শূন্যে অবস্থান করছে

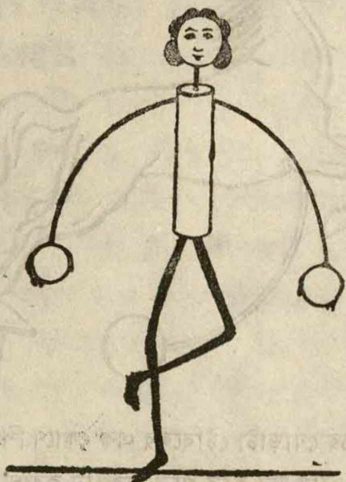
বসিয়ে দাও না কেন, সে পিছনের পায়ে ভর করে শূন্যেই অবস্থান করবে।

৫.

হাল্কা একটা লম্বা নলের তলার দিকটা যদি পারা বা সীসা ভর্তি করে ভারী করে দেওয়া যায়, তবে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? নলটা সর্বদাই খাড়া হয়ে থাকবে। চেপে ধরে কাৎ করতে পার বটে, কিন্তু ছেড়ে দেওয়ামাত্র সে আবার খাড়া হয়ে দাঁড়াবে। এরূপ ব্যবস্থা অন্য উপায়েও করা যায়। উপরের ছবিটা দেখেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে।

দুই ইঞ্চি লম্বা এক টুক্‌রা কর্ক বা হাল্কা কাঠের উপরের দিকে মাথা এবং নীচের দিকে পায়ের মত তৈরি করে নাও। স্প্রিঙের

মত দুটো বাঁকানো ইস্পাতের তার, কর্ক বা কাঠটার গায়ে হাতের মত করে বেশ এঁটে বসিয়ে দাও। তার দুটোর প্রান্তভাগে পুতুলটার



কর্কের পুতুল

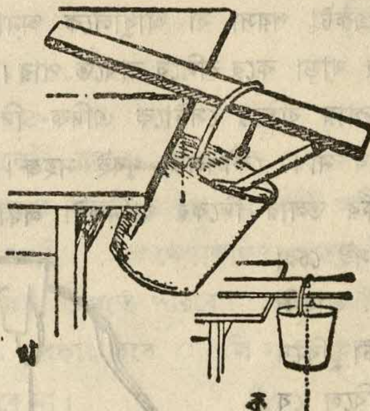
তারের দুটো হাতে দুটো ভারী বল। পুতুলটাকে
সুতোর উপর বা আঙুলের ডগায় রাখ
সেটা খাড়া হয়েই দাঁড়িয়ে থাকবে।

ওজনের অনুপাতে দুটো সীসার বল বসিয়ে দিতে হবে। দেখবে, বল দুটো বসাবার সঙ্গে সঙ্গেই পুতুলটা খাড়া হয়ে থাকবে। এই অবস্থায় যেখানে রাখবে, পুতুলটা সেখানেই খাড়াভাবে অবস্থান করবে। প্যাকাটি, ঝাঁটার কাঠি এবং মাটির ডেলা দিয়েও এটা করতে পার।

৬.

প্রথমে দুখানা চ্যাপটা কাঠ যোগাড় কর। একখানা হাত দেড়েক লম্বা, আর একখানা হাতখানেক বা আরও কিছু ছোট হলেও চলবে। লম্বা কাঠখানার উপর জল-ভর্তি একটা বালতি ঝুলিয়ে

দাও। ছোট কাঠখানা তের্ছাভাবে বাল্তির মধ্যে ঢুকিয়ে বড়খানার সঙ্গে এমনভাবে ঠেকা দিয়ে দাও, যাতে জলসমেত বাল্তিটা অনেকটা



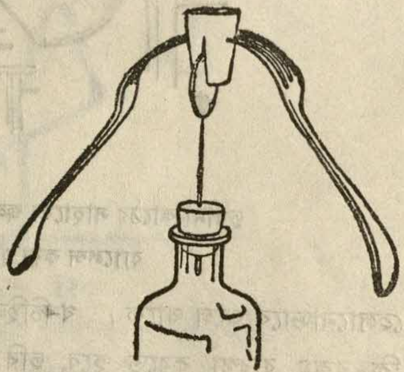
দুখানা কাঠের সাহায্যে জল-ভরা বাল্তিটাকে
ব্যালেন্স করা হয়েছে

হেলানোভাবে ঝুলে থাকে। খ-চিহ্নিত ছবিটা ভাল করে দেখে নাও। কি রকম ব্যবস্থা করতে হবে, ছবি দেখেই পরিষ্কার বুঝতে পারবে। এবার বাল্তি সমেত বড় কাঠখানাকে টেবিলের ধারে বা যে কোন একটা স্ট্যাণ্ডের উপর রেখে দাও। দেখবে, অত ভার নিয়েও বাল্তি কেমন কাঠটাকে নিয়ে ঝুলে আছে। দুলিয়ে দিলে উপরে নীচে দোল খাবে বটে, কিন্তু পড়ে যাবে না। বাল্তিটাকে যদি ঠেকা দিয়ে হেলানোভাবে না রেখে ক-চিহ্নিত ছবির মত সোজাভাবে কাঠখানার সঙ্গে ঝুলিয়ে দাও তবে কিছুতেই তাকে টেবিলের ধারে বা স্ট্যাণ্ডের উপর বসিয়ে রাখতে পারবে না।

৭.

বোতলের মুখে আঁটা ছিপির উপর খাড়াভাবে একটা সূচ অথবা আলপিন বসানো রয়েছে। একটা পয়সা বা আধুলিকে ওই সূচ বা

আলপিনটার ডগায় খাড়াভাবে বসিয়ে রাখতে পার কি ? চেষ্টা করে দেখো—কিছুতেই খাড়াভাবে বসিয়ে রাখতে পারবে না। কিন্তু সাধারণ একটা কৌশলে একটা পয়সা বা আধুলিকে অনায়াসে সূচ বা আলপিনের ডগায় খাড়া করে বসিয়ে রাখতে পার। এমন কি, সূচ বা আলপিনের ডগায় বসিয়ে সেটাকে এদিক-ওদিক একটু দুলিয়ে দিলেও পড়ে যাবে না। কৌশলটা খুবই সহজ। ধারালো ছুরি দিয়ে একটা কর্কের তলার দিকের খানিকটা লম্বালম্বিভাবে চিরে ফেল। কর্কের সেই চেরা দিকটায় একটা আধুলি জোর করে অর্ধেকটা ঢুকিয়ে দাও। খাবার টেবিলে যে রকম কাঁটা-চামচ ব্যবহৃত হয়, ঠিক সে রকমের দুটো কাঁটা যোগাড় কর। কর্কটার গায়ে পরস্পরের ঠিক বিপরীত দিকে হেলানভাবে কাঁটা দুটোকে ফুটিয়ে দাও।



একটা আধুলিকে পিনের ডগায় খাড়াভাবে রাখা হয়েছে

এবার কর্কে আটকানো আধুলিটাকে সব সমেত সূচ বা আলপিনের ডগায় বসিয়ে দাও। দেখবে—কর্কে আটকানো কাঁটা দুটো নিয়ে আধুলিটা আলপিনের ডগায় খাড়াভাবেই বসে থাকবে। একটু দুলিয়ে দিলেও কয়েকবার দোল খেয়ে ঠিক একই জায়গায় স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে—পড়ে যাবে না। ছবিটা ভাল করে দেখে নাও। ব্যবস্থাটা বুঝতে একটুও অসুবিধা হবে না।

বিদ্যুতের খেলা

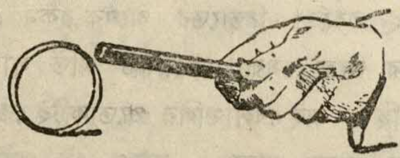
১.

তোমরা অনেকেই হয়তো বিদ্যুতের অনেক-রকম খেলা দেখেছ। এখানে তোমাদের জন্যে সেরূপ কয়েকটি অতি সাধারণ বিদ্যুতের খেলার কথা বলছি। এই খেলাগুলির প্রত্যেকটিই তোমরা অনায়াসে নিজের হাতে করে দেখতে পারবে। কারণ এই পরীক্ষাগুলিতে যে সব জিনিষের দরকার হবে, সেগুলি সংগ্রহ করতে তোমাদের মোটেই বেগ পেতে হবে না।

খুব পাত্‌লা অথচ শক্ত একখানা কাগজ থেকে নয় ইঞ্চি লম্বা, আধ ইঞ্চি চওড়া এক ফালি কাগজ কেটে নাও। এই কাগজের ফালিটার দু-প্রান্ত আঠা দিয়ে জুড়ে সম্পূর্ণ গোলাকার একটা রিং-এর মত তৈরি কর। কাগজের রিংটা এমন নিখুঁতভাবে তৈরি করবে, জোড়ামুখ যেন একটুও উঁচু-নীচু হয়ে না থাকে। মসৃণ টেবিলের উপর রিং-টাকে খাড়াভাবে রেখে ফুঁ দিয়ে দেখবে যেন বেশ গড়িয়ে যেতে পারে। এবার একটা গালার রড্ (সিল-মোহর করবার জন্যে যে গালার রড্ পাওয়া যায়) অথবা কাচের রড্ (ফ্লিন্ট গ্লাস অথবা লেড্ গ্লাসের রড্ ব্যবহার করা দরকার) যোগাড় কর। একখণ্ড ফ্লানেল নিয়ে রড্‌টাকে কিছুক্ষণ বেশ করে ঘষে নাও। ঘষবার পর রড্‌টাকে ছোট ছোট সুতোর ফেক্‌রি, চুল বা কাগজের টুক্‌রোর কাছে নিয়ে এসো। দেখবে—রড্‌টা যেন চুম্বকের মত ব্যবহার করছে। কাগজ, সুতো প্রভৃতির টুকরোগুলি লাফিয়ে উঠে রড্‌টার গায়ে লেগে যাবে। ফ্লানেল দিয়ে ঘষবার আগে কিন্তু রড্‌টার এই গুণ দেখতে পাবে না। ঘষবার ফলে রড্‌টা তড়িতাবিষ্ট হয়। এই তড়িতাবেশই সুতো কাগজ প্রভৃতি

হাল্কা পদার্থের টুক্‌রোগুলিকে আকর্ষণ করবার কারণ।

আচ্ছা, এবার কাগজের রিঙের পরীক্ষাটা করে দেখ। কাগজের রিংটাকে টেবিলের উপর রেখে ফ্লানেল-ঘষা গালা বা কাচের রড্‌টাকে একটু কাছে নিয়ে এস। দেখবে, কাগজের রিংটা গড়িয়ে এসে রডের গায়ে লাগতে চাইবে। তুমি যদি সেটাকে রডের গায়ে লাগতে না



কাগজের রিং ও কাচের রডের পরীক্ষা

দিয়ে ক্রমাগত সরিয়ে নাও তবে কাগজের রিংটাও চাকার মত গড়িয়ে গড়িয়ে টেবিলের সর্বত্র তাকে অনুসরণ করতে থাকবে। ছবি থেকেই ব্যাপারটার পরিষ্কার ধারণা করতে পারবে।

২.

পাত্‌লা একখণ্ড সাধারণ লেখবার কাগজ একটু গরম করে নাও। কাগজখানাকে টেবিলের উপর রেখে হাত দিয়ে খানিকক্ষণ বেশ করে ঘষে দাও। কিছুক্ষণ বাদেই দেখবে, কাগজখানা যেন টেবিলের সঙ্গে লেগে গেছে—টেবিলটাকে কাৎ করলেও গড়িয়ে পড়ে

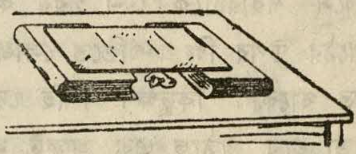


কাগজখানা টেবিলের উপর রেখে হাত দিয়ে ঘষা হচ্ছে

না। এবার যদি হাত দিয়ে কাগজখানার একটা কোণ খানিকটা তুলে

ধর—দেখবে, কাগজটা যেন লাফিয়ে ওঠবার চেষ্টা করবে। কাগজখানা টেবিল ছেড়ে লাফিয়ে উঠলে তোমার হাতে বা জামা-কাপড়ে আটকে থাকতে চাইবে। এ রকমের কাগজ মুখের কাছে ধরলে সুড়সুড়ির মত একটা অবস্থা অনুভব করবে। ঘর্ষণের ফলে কাগজখানা তড়িতাবিষ্ট হয় বলেই অন্য কোন নিস্তড়িৎ পদার্থের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে।

৩



কাগজের টুক্‌রোর লাফানো

টেবিলের উপর পরস্পর থেকে কিছুটা তফাতে তুখানা বই রাখ। বই তুখানার উপর একখানা চওড়া কাচ বসিয়ে দাও। কাচখানার তলায় টেবিলের উপর ছোট ছোট কতকগুলি কাগজের টুক্‌রো রেখে দাও। এবার কাচখানাকে বেশ কিছুক্ষণ ঘষতে থাক। কিছুক্ষণ ঘষবার পরেই দেখবে, নীচের কাগজের টুক্‌রোগুলি অদ্ভুত রকমে লাফাতে সুরু করেছে। কাগজের টুক্‌রোগুলি যদি ব্যাং বা কয়ারফড়িং প্রভৃতির আকারে কাটা হয়, তবে এই লাফানোর ব্যাপারটা বেশ কৌতুকপ্রদ হবে। কাচখানা তড়িতাবিষ্ট হবার ফলেই এরূপ অবস্থা ঘটে। কিরকম করে কাচখানা রাখতে হবে, ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে।

এসব পরীক্ষা করবার সময় জিনিষগুলিকে বেশ করে শুকিয়ে বা গরম করে নেওয়া দরকার। শীতকালের শুষ্ক আবহাওয়ায় এজন্যে পরীক্ষাগুলি সহজে করা যায়; কিন্তু বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকলেই পরীক্ষার ব্যাপারে অনেকটা অসুবিধা হবে।

৪.

তোমরা লক্ষ করে থাকবে রাবার বা ওই ধরনের কোন পদার্থের চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়ালে চুলগুলি যেন খাড়া হয়ে ওঠে এবং অস্ফুট মট্‌মট্‌ আওয়াজ শোনা যায়। অবশ্য শুষ্ক আবহাওয়া-তেই এরূপ ব্যাপার বেশী ঘটে। চুলের সঙ্গে চিরুণীর ঘর্ষণে যে তড়িৎ উৎপন্ন হয়, তার ফলেই এরূপ ব্যাপার ঘটে থাকে। আর একটা সহজ পরীক্ষায় এই ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে দেখতে পার। অবশ্য শীতকালেই এই পরীক্ষাটা বেশী ভাল হয়। উনুনের পাশে বসে শরীরটাকে বেশ গরম করেছে, এ-রকমের একটা বিড়ালের পিঠের উপর ক্ষিপ্র গতিতে সোজা বা উল্টোদিক থেকে হাত বুলাতে থাকো। কিছুক্ষণ পরেই দেখবে—বিড়ালটার লোমগুলি সব খাড়া হয়ে উঠেছে এবং অস্ফুট মট্‌মট্‌ শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঘর্ষণজনিত তড়িৎ উৎপত্তির ফলেই এরূপ ব্যাপার ঘটে



বিড়ালের সাহায্যে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ উৎপাদন

থাকে। ঘর্ষণের পর যদি তোমার হাত মুঠো করে বিড়ালটার নাকের কাছে আন, তবে একটা পরিষ্কার বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ তার নাকের ডগা

থেকে তোমার হাতের মধ্য দিয়ে চলে যাবে। এতে বিড়ালটাও আঁতকে উঠবে। অন্ধকার ঘর এবং কালো বিড়ালের সাহায্য নিলে এই পরীক্ষায় বেশ সুন্দরভাবে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ দেখা যেতে পারে।

৫.

খুব পাত্‌লা অ্যালুমিনিয়ামের পাত কেটে এরোপ্লেনের মত তৈরি কর। একটা এবোনাইট রড্‌কে ফ্লানেল দিয়ে বেশ করে ঘষে নাও। রড্‌টাকে এরোপ্লেনটার কাছে আন-বামাত্রই সেটা লাফিয়ে উঠে এসে তার গায়ে লেগে যাবে এবং রডের তড়িৎ খানিকটা আহরণ করবে। উভয়েই তখন সহধর্মী তড়িতাবিষ্ট হওয়ায় এরোপ্লেনটা তৎক্ষণাৎ আবার রড্ থেকে লাফিয়ে সরে যাবে। এই অবস্থায় রড্‌টাকে পিছু পিছু চালিয়ে নলে যতক্ষণ খুশী যে কোন দিকে এরোপ্লেনটাকে উড়ন্ত অবস্থায় রাখা যেতে পারে।


এরোপ্লেনের খেলা

স্বয়ংক্রিয় কাচগোলক

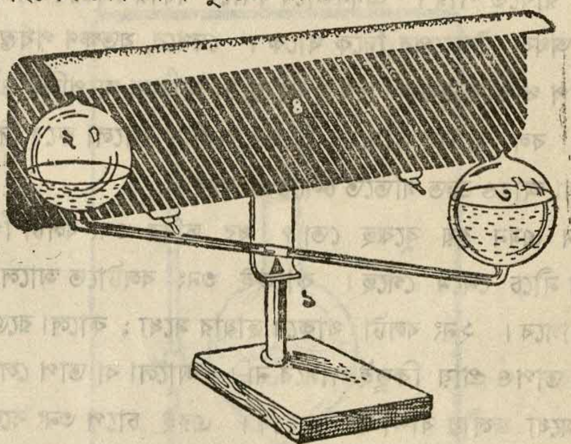
এবার তোমাদের চমৎকার একটা বৈজ্ঞানিক খেলার কথা বলবো। একটু চেষ্টা করলে অনায়াসেই যন্ত্রটা তৈরি করে প্রচুর আমোদ পেতে পার।

৫।৬ ইঞ্চি লম্বা সরু একটা কাচের নলের দু-দিকে দুটো কাচের ফাঁপা বল। দেখতে অনেকটা ডাম্বেলের মত। পাল্লার দাঁড়ির মত ডাম্বেলটা একটা স্ট্যাণ্ডের উপর আল্‌তোভাবে বসানো রয়েছে। স্ট্যাণ্ডসমেত যন্ত্রটাকে রোদে বসিয়ে দিলেই ডাম্বেলটা যদি একবার এদিক আবার ওদিক অনবরত ওঠা-নামা করতে থাকে, তবে সেটাকে যন্ত্র-কৌশলের একটা অদ্ভুত খেলা বলে মনে হবে না কি? ইচ্ছা করলে তোমাদের মধ্যে অনেকেই এরকম একটা যন্ত্র তৈরি করে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির পরিচয় দিতে পার। অবশ্য ডাম্বেলের মত কাচের জিনিসটা তৈরি করতে বড়দের সাহায্য নিতে হবে। কাচ গলিয়ে যারা নানারকম জিনিস তৈরি করে, তাদের দিয়ে কাচের ডাম্বেলটা তৈরি করে নিতে পারলে বাকীটা তোমরা নিজের হাতেই করতে পারবে।

একটা কাচের নলের দু'পাশে দুটো ফাঁপা বল থাকবে। বল দুটোকে ডাম্বেলের মত ঠিক সোজাসুজি না রেখে একদিকে সম-কোণে বাঁকিয়ে দিতে হবে। মুখ বন্ধ করে দেবার আগে একটা বলের অর্ধেকের কিছু বেশী জল ভর্তি করে সেটাকে আগুনের উপর ধরলেই জল গরম হয়ে বাষ্প উঠতে থাকবে। এর ফলে বলের ভিতরকার বাতাস বেরিয়ে যাবে। বাষ্প বেরুবার সময় বলের খোলা মুখটির কাচ গলিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। অপর বলটাকেও গরম করে মুখ বন্ধ করতে হবে। ঠাণ্ডা হলেই বাষ্প জলে পরিণত হবে এবং জল ছাড়া বাকী জায়গাটুকু বায়ুশূন্য থাকবে। একটা বলের অর্ধেকের বেশী জলে ভর্তি, অপরটা খালি। এই অবস্থায় বল দুটোকে উপরের দিকে রেখে নলটাকে শয়ানভাবে ধরে, জলের দিকটায় একটু তাপ দিলেই দেখবে—জল থেকে কিছু পরিমাণে বাষ্প উৎপন্ন হচ্ছে। এই বাষ্পের চাপে জলটা ক্রমশঃ সরে গিয়ে খালি বলটায় উপস্থিত হবে। কাচের এই যন্ত্রটাকে যদি একটা স্ট্যাণ্ডের উপর ঢেঁকিকলের মত বসিয়ে দেওয়া যায়

তবে বেশী জল ভর্তি বলটা জলের ভারে নীচের দিকে নেমে যাবে। এমন কোন কৌশলে যদি একবার এ-বলের জলকে ও-বলে, আবার ও-বলের জল এ-বলে নেবার ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে কাচের ডাম্বেলটা পর্যায়ক্রমে একবার এ-দিকে আবার ও-দিকে ওঠা-নামা করতে থাকবে।

কি কৌশলে এরূপ করা যেতে পারে, সেটা ভাল করে বুঝিয়ে দেবার জন্যে ছবি দেওয়া হলো। ছবিখানা মনোযোগ দিয়ে দেখে নাও, তাহলেই কৌশলটা বুঝতে পারবে।



স্বয়ংক্রিয় কাচ-গোলক। রোদে রাখলেই যন্ত্রটা
ঢেঁকিকলের মত ওঠা-নামা করতে থাকে

১নং একটা স্ট্যাণ্ড উপরে ঢেঁকিকলের মত ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাচের নলটার ঠিক মধ্যস্থলে একটা পিতলের পাত চোঙের মত গোল করে এঁটে দিয়ে তার নীচের দিকে তেকোণা কাচের মত ছোট্ট একটু লোহা বা পিতলের টুক্‌রো জোড়া দেওয়া হয়েছে। এই তেকোণা টুক্‌রোটুকুর উপরেই ২ এবং ৩ নম্বরের বল সমেত কাচের নলটা ঢেঁকিকলের মত বসানো আছে।

১নং স্ট্যাণ্ডের পিছনের দিকে ৪ নম্বরের জিনিসটার মত পিতল বা টিনের একখানা পাত্‌লা পর্দা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এই টিন বা

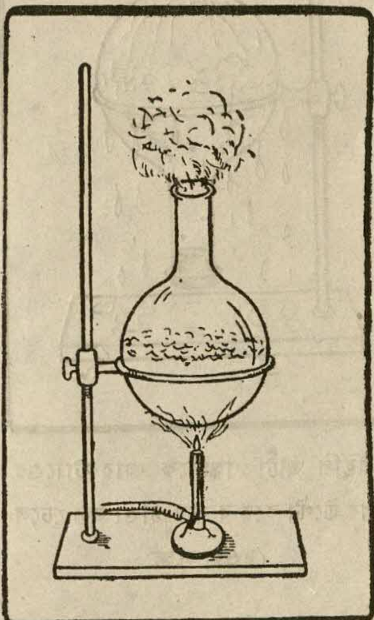
পিতলের পর্দাখানার পিছনের দিকটা থাকবে খুব চক্‌চকে পালিশ করা আর সামনের দিকটা কালো রং দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এই পর্দার নীচে দুদিকে দুটো পিন ছবির মত করে বসানো থাকবে; ফলে বল দুটো কোন রকমেই নির্দিষ্ট সীমা ছেড়ে বেশী উঁচুতে উঠতে পারবে না।

পর্দার চক্‌চকে দিকটা আলোর দিকে রেখে যন্ত্রটাকে এবার রোদে বসিয়ে দাও। উত্তপ্ত চুল্লী বা অন্য কোন উজ্জ্বল আলোকাধারের কাছেও রাখতে পার। এমনভাবে বসাবে পর্দার চক্‌চকে দিকটা যেন আলো অথবা উত্তাপের দিকে থাকে। দেখবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আলো বা উত্তাপ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত বল দুটো আপনা-আপনিই ওঠা-নামা করছে। বল দুটোর সামনের দিকের অর্ধাংশ কালো করে দিলে এই ওঠা-নামা আরও দ্রুত গতিতে চলতে থাকবে।

কেন এমন হয় বুঝেছ তো? ধর ছবির ৩নং বলটা পিতলের পর্দাটার নীচে নেমে গেছে। কাজেই ৩নং বলটাতে আলো অথবা তাপ লাগবে। ২নং বলটা থাকবে ছায়ার মধ্যে; কালো রঙের জন্যে সেটাতে তাপও প্রায় কিছুই লাগবে না। আলো বা তাপ লেগে ৩নং বলের মধ্যে জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হবে। এরই চাপে ৩নং বলের জল ধীরে ধীরে ২নং বলে প্রবেশ করতে থাকবে। যখন ২নং বলের জলের পরিমাণ ৩ নম্বরের চেয়ে কিছু বেশী হবে, তখনই ভারে ২নং বলটা নীচে নেমে আসবে এবং ৩ নম্বরের বলটা যাবে ছায়ার মধ্যে। এবার ২ নম্বরের বলটা আলোতে চলে আসবার ফলে সেটার মধ্যে বাষ্প উৎপন্ন হবে এবং বাষ্পের চাপে জল আবার ৩নং বলে প্রবেশ করে সেটাকে নীচে নামিয়ে আনবে। এভাবে ক্রমাগত ওঠা-নামা চলতেই থাকবে।

ঠাণ্ডা দিয়ে জল ফোটানো

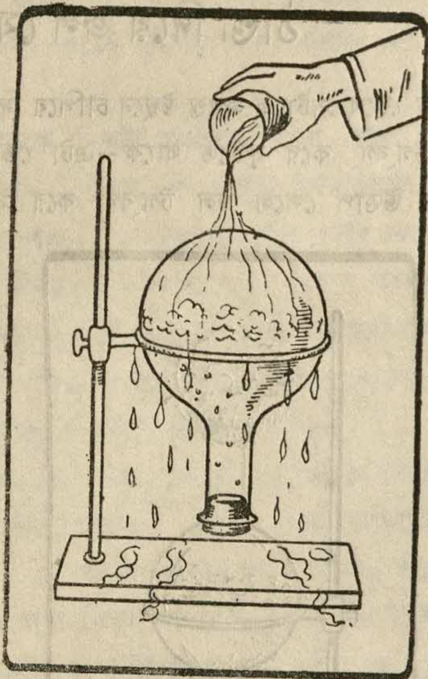
একটা পাত্রে জল রেখে সেটাকে জ্বলন্ত উনুনে চাপিয়ে দিলে কিছুক্ষণ বাদেই জলটা টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে থাকে—এটা তোমরা সবাই দেখেছ। উপযুক্ত উত্তাপ পেলে জল টগ্‌বগ্‌ করে ফুটবে—এটা



খোলামুখ ফ্লাস্কে জল ফোটানো হচ্ছে

কিছুমাত্র অদ্ভুত ব্যাপার নয়। কিন্তু উত্তাপের পরিবর্তে ঠাণ্ডা দিলে জল যদি টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে থাকে, তবে সেটাকে তোমরা নিশ্চয়ই অদ্ভুত ব্যাপার বলে মনে করবে। তোমরা হয়তো বিশ্বাস করতেই চাইবে না যে, ঠাণ্ডা দিলে জল টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে পারে। ব্যাপারটা কিন্তু অদ্ভুতও নয় বা অস্বাভাবিকও নয়। ঘরে বসে যাতে সহজেই

পরীক্ষা করে দেখতে পার, সে উপায়টা বলে দিচ্ছি। দেখবে, ঠাণ্ডা দিলে জল কেমন টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে থাকে!



ছিপি আঁটা ফ্লাস্কটাকে এবার স্ট্যাণ্ডের উপর উল্টো করে বসিয়ে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেওয়া হচ্ছে

ছবিতে যেমন আঁকা আছে, সেরূপ একটা কাচের ফ্লাস্ক যোগাড় করে নাও। যে কোন রকম কাচের শিশি-বোতলে চলবে না, কারণ একটু বেশী তাপ দিলেই সেগুলি ফেটে যাবে। ওই রকমের ফ্লাস্ক যে কোন সায়েন্টিফিক ইনস্ট্রুমেন্টের দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। ফ্লাস্কটাকে প্রায় অর্ধেক জল ভর্তি করে মুখ খোলা রেখেই লোহার একটা স্ট্যাণ্ডের গায়ে আটকানো রিং-এর উপর ছবির মত করে বসিয়ে দাও। তারপর গ্যাস-বার্ণার জ্বেলেই হোক বা স্পিরিট-ল্যাম্প জ্বেলেই

হোক, ফ্লাস্কটার তলায় উত্তাপ দিতে থাক। জল যখন টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে থাকবে এবং ফ্লাস্কের মুখ দিয়ে বাষ্প বেরুতে থাকবে, তখন গ্যাস-বার্ণারটাকে সরিয়ে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে একটা রাবারের ছিপি দিয়ে ফ্লাস্কের মুখটাকে বেশ ভাল করে বন্ধ করে দাও। গ্যাস-বার্ণার বা স্পিরিট-ল্যাম্পটাকে সরিয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখবে—আস্তে আস্তে ফ্লাস্কের জলের টগ্‌বগানি থেমে গেছে এবং জলটা ঠিক সমতলে শান্তভাবে রয়েছে। এবার জলসমেত ফ্লাস্কটার মুখ নীচু দিকে রেখে দ্বিতীয় ছবিটার মত করে রিং-এর উপর বসিয়ে দাও। ফ্লাস্কের তলার গোল দিকটা থাকবে এবার উপরের দিকে। এবার এক গ্লাস জল ঢেলে দাও। দেখবে, ফ্লাস্কের ভিতর সেই শান্ত জল আবার টগবগ করে ফুটে উঠছে। ছবির সঙ্গে মিলিয়ে পরীক্ষাটা করতে পারলে একবারেই কৃতকার্য হবে।

কেন এমন হয়, বলতে পার? ব্যাপারটা বিশেষ কিছু নয়। খাল, বিল, পুকুরের জলকে সর্বদাই আমরা শান্তভাবে থাকতে দেখি। আদতে কিন্তু সে অত শান্ত নয়। একটু সুবিধা পেলেই সে অশান্ত হয়ে ওঠে এবং বাষ্প হয়ে উবে যেতে চায়। বায়ুমণ্ডলের প্রবল চাপে সে তা পেরে ওঠে না। এক ইঞ্চি লম্বা, এক ইঞ্চি চওড়া স্থানের উপর বায়ুর চাপ হচ্ছে প্রায় সাড়ে সাত সের। হিসেব করে দেখ, সামান্য এক গ্লাস জলের উপরেই তাতে কত চাপ পড়ে! যদি কোন রকমে এই চাপ সরিয়ে দেওয়া যায়, তবে জল মুক্তি পেয়ে উচ্ছৃঙ্খলভাবে দাপাদাপি করে উবে যাবার চেষ্টা করে। তার ফলেই সুরু হয় টগ্‌বগানি। গরম দিলে জলের উপরকার বাতাস হাল্কা হয়ে সরে যায় আর বাষ্প তার স্থান অধিকার করে। কাজেই বাষ্প ওঠবার সময় ফ্লাস্কের ছিপি বন্ধ করলে তার মধ্যে বাতাস কিছুই থাকে না। তবুও আবদ্ধ বাষ্পের চাপে জলকে শান্তভাবে অবস্থান করতে হয়। ফ্লাস্কটাকে উল্টো করে অনেকটা জায়গায় এক সঙ্গে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিলে ভিতরের বাষ্প তৎক্ষণাৎ জমাট বেঁধে জলকণারূপে ফ্লাস্কের

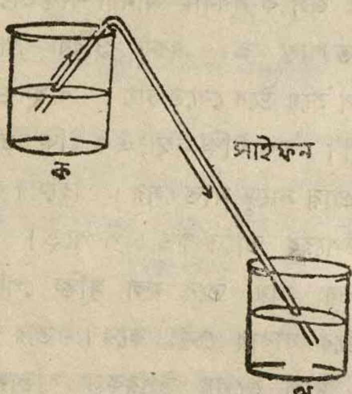
জলের সঙ্গে মিশে যায় এবং সে সময় বাতাস বা বাষ্প কিছুই না থাকাতে জল অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্যে চাপমুক্ত হয়ে লাফালাফি সুরু করে দেয়।

সাইফন

১০

তাকের উপর একটা গ্লাসে খানিকটা জল রয়েছে। গ্লাসটাকে কাৎ না করে—এমন কি, কোন রকম নাড়াচাড়া না করে, সবটা জল কেমন করে নীচের গ্লাসে আনা যায়—বল দেখি? গ্লাসের তলায় একটা ফুটো থাকলে অবশ্য ব্যাপারটা খুব সহজ হতো; কিন্তু তাও নেই। তবে কেমন করে সম্ভব?

তোমরা অনেকেই হয়তো সাইফনের কথা জান। সাইফন একটা বাঁকানো নল; কাচেরও হতে পারে, রবারেরও হতে পারে। গ্লাসটাকে



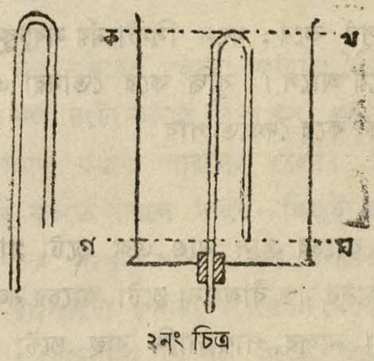
১নং চিত্র
সাইফনের ক্রিয়া

কাৎ না করে বা কোন রকম নাড়াচাড়া না করে সাইফনের সাহায্যে সবটুকু জল অনায়াসেই নীচের গ্লাসে আনা যায়। ১ নম্বরের ছবিটা দেখে নাও। নলের বাঁকানো দিকটা উপরের গ্লাসের জলের তলা

পর্যন্ত ডুবিয়ে রেখে নীচের দিকটায় মুখ দিয়ে বাতাস টেনে নিয়ে ছেড়ে দাও। সঙ্গে সঙ্গে জল চলে আসবে এবং উপরের গ্লাসের সবটুকু জল নীচের গ্লাসে এসে জমা হবে! তাছাড়া আর এক রকমেও এটা করতে পার। নলটাকে জলে ভর্তি করে আঙুল দিয়ে মুখ বন্ধ কর এবং বাঁকানো মুখটা গ্লাসের জলে ডুবিয়ে আঙুল ছেড়ে দাও। দেখবে একই রকমের ফল হচ্ছে।

২.

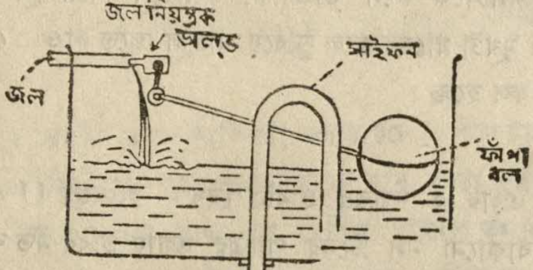
আচ্ছা, এবার ২ নম্বরের ছবিটা দেখ। ইংরেজী U অক্ষরের মত একটা বাঁকানো নল টিনের পাত্রের তলায় ছবির মত করে বসানো রয়েছে। টিনের পাত্রটাকে যদি ক খ লাইন অবধি জলপূর্ণ করা যায়, তাহলে দেখবে—গ ঘ লাইন অবধি সবটুকু জল নলের মধ্য দিয়ে নীচে চলে যাবে।



২নং চিত্র

ময়লা পরিষ্কার করবার জন্যে সহরের বাড়ীর বাথরুমে সিস্টার্নের ব্যবস্থা দেখেছ তো—শিকল টানলেই হু হু করে জল বেরিয়ে আসে? U অক্ষরের মত বাঁকানো সাইফনের সাহায্যেই এটা সম্ভব হয়ে থাকে? ছবিটা দেখে নাও। সিস্টার্নের একপাশে উপরের দিকে জলের পাইপ রয়েছে। পাইপের মুখে আছে একটা ভাল্‌ভ্‌। ভাল্‌ভের সঙ্গে সংলগ্ন লম্বা হাতলের মাথায় লাগানো রয়েছে একটা ফাঁপা বল; সিস্টার্নের মধ্যস্থলে বসানো আছে সাইফন। সিস্টানে

জল ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলটাও উপরে উঠতে থাকে। ফলে, জল সাইফনের বাঁকানো অংশ ডুবিয়ে দেবার আগেই পাইপের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। ঘণ্টার মত আকৃতিবিশিষ্ট একটা ধাতব পাত্র সিস্টার্নের



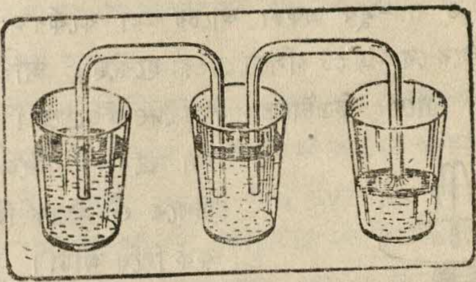
সিস্টার্নের ভিতরের ব্যবস্থা

মধ্যে সাইফনটাকে ঢেকে রাখে (ছবিতে সেটা দেখানো হয় নি.)। শিকলের টানে ঘণ্টার সঙ্গে জল উপরে উঠে গিয়ে সাইফনের বাঁকানো অংশটাকে জলপূর্ণ করে; ফলে সিস্টার্নের সবটুকু জল সাইফন দিয়ে হু হু শব্দে বেরিয়ে আসে। বুদ্ধি করে তোমরা এর একটা স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থারও পরীক্ষা করে দেখতে পার।

৩.

গোটা তিনেক কাচের গ্লাস নাও এবং দুটো গ্লাসে জল ভর্তি কর; ইংরেজী U অক্ষরের মত বাঁকানো দুটো কাচের নল যোগাড় করতে হবে। বাঁকানো নলের পাশাপাশি বাহু দুটো হবে গ্লাসের চেয়েও লম্বা; মধ্যের অংশটা ইচ্ছামত লম্বা করতে পার। কাচের বাঁকানো নল দুটোকে জলে ভর্তি কর। আঙুলে দু-মুখ চেপে ছবির মত করে নল দুটোকে গ্লাসের জলে উবুড় করে বসিয়ে দাও। এবার এক একটা গ্লাসকে একটু উঁচু-নীচু করলেই অথবা দুই গ্লাসের জলের 'লেভেল' সমান না থাকলেই দেখবে—এক গ্লাসের জল আর এক গ্লাসে চলে আসছে। এক বাল্‌তি জলের মধ্যে যদি এ রকমের জল ভর্তি একটা বাঁকানো নল বসাও এবং বাল্‌তির বাইরে নলের বাহুটি যদি বাল্‌তির

তলা থেকে কিছুটা নীচুতে নামাও তবে দেখবে, বাল্‌তির তলার শেষ জলটুকু নল বেয়ে বাইরে গড়িয়ে পড়েছে।



সাইফনের ক্রিয়া

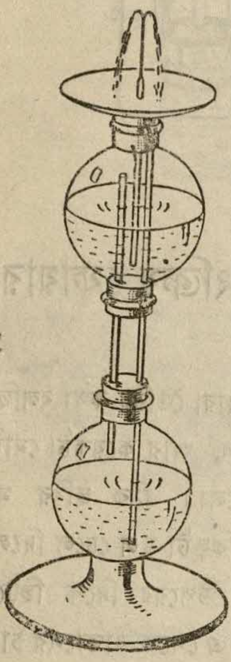
স্বয়ংক্রিয় ফোয়ারা

১.

এবার তোমাদের এক রকমের খেলনা ফোয়ারা তৈরির কথা বলছি। তিনটে সরু কাচের নল, দুটো কাচের ফাঁপা বল, আর কয়েকটা মোটা কর্কের ছিপি যোগাড় করতে পারলেই হলো। ঠিক ছবির মত জিনিসটাকে তৈরি করতে পারলে দেখবে—কিছুটা জল ঢেলে দিলেই ফোয়ারার মুখ থেকে আপনা-আপনি জল উপরের দিকে ছিট্‌কে উঠতে থাকবে। ব্যাপারটা খেলনা হলেও এ থেকে বাতাসের চাপ, উপরে জল তোলবার বৈজ্ঞানিক কৌশল সম্বন্ধে অনেক কিছু বুঝতে পারবে। দু-হাজার বছরেরও আগে হিরো নামে আলেকজান্ড্রিয়ার একজন গাণিতিক ও দার্শনিক এই অপূর্ব জিনিষটিকে সর্বপ্রথম তৈরি করেছিলেন।

জিনিষটা কি রকম হবে—ছবিটাকে ভাল করে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে। উপরের অংশটা চায়ের পিরিচের মত একটা জিনিষ। এর মাঝখানে বেশ মোটা একটা ছিদ্র আছে। এই জিনিষটা মাটি, কাঠ, টিনের পাত বা অন্য যে কোন কিছুর তৈরি হলেই চলবে।

পিরিচের মাঝখানে ছিদ্রের মধ্যে একটা মোটা কর্কের ছিপি আঁটা। ছিপিটার মধ্যস্থলে ও এক পাশে দুটো সরু ছিদ্র থাকবে। আই-ড্রপারের মত সরু-মুখ একটা কাচের নল কর্কের মধ্যের ছিদ্রটাতে ছবির মত করে বেশ এঁটে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর একটা লম্বা কাচের নল পাশের ছিদ্রটাতে গলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাচের ফাঁপা বল দুটো, বোতলের মুখের মত উপরে ও নীচের দিকে ছিদ্র-করা কর্ক দিয়ে আঁটা। সবচেয়ে লম্বা কাচের নলটাকে, ছবিতে যেমন আছে তেমনি করে কাচের বল দুটোর কর্কের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে বেশ করে এঁটে দিতে হবে। তাছাড়া আর একটা বড় ও একটা ছোট কাচের নল ছবির মত করে পরিয়ে দিতে হবে। কাচের বলটাকে ছবির মত যে কোন একটা স্ট্যাণ্ডের উপর এঁটে বসিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে। উপরের কাচের বলটার মধ্যে আগে থেকেই প্রায় পুরোপুরি জল ভর্তি করে দেবে। নীচের বলটা থাকবে খালি।



হিরোর ফোয়ারা

এবার পিরিচখানার মধ্যে খানিকটা জল ঢেলে দাও। পিরিচের জল লম্বা নলের ভিতর দিয়ে নীচের বলের মধ্যে জমতে থাকবে। জল ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই বলের বাতাস ছোট নলটার ভিতর দিয়ে উপরের বলের মধ্যে প্রবেশ করে জলের উপর চাপ দেবে। বাতাসের এই চাপের ফলে উপরের বলের জল সরু-মুখ নলটা দিয়ে ফোয়ারার মত উপরের দিকে ছিটকে উঠতে থাকবে। ফোয়ারার জলটা পিরিচখানার

মধ্যেই পড়বে। সেই জলটা আবার লম্বা নল দিয়ে ক্রমাগত নীচের বলটার জলের উপর বাতাসের চাপ বাড়িয়ে তুলতে থাকবে। এর ফলে উপরের বলের ভিতরকার সব জলটাই ধীরে ধীরে ফোয়ারার আকারে বেরিয়ে আসবে।

এখানে কাচের জিনিসের কথাই বলেছি। বুদ্ধি করে যদি অন্য কিছু দিয়ে তৈরি করতে পার তাতেও একই রকমের কাজই হবে। এই জিনিষটাকে ঠিক ছবির মত না করে অন্যভাবেও করা যেতে পারে। জলটা কেন আপনা-আপনি ফোয়ারার মত উপরে উঠে যায়—এই রহস্যটা যদি বুঝতে পেরে থাক, তবে তোমরা নিজেরাই বুদ্ধি করে আরও অন্যান্য কৌশলে এ রকমের জিনিষ তৈরি করতে পারবে।

২.

স্বয়ংক্রিয় ফোয়ারা তৈরির আর একটা কৌশলের কথা বলছি। এটা হিরোর যান্ত্রিক কৌশলের চেয়ে অনেকটা সহজ। তবে এই যন্ত্রটা কোন গ্লাস-ব্লোয়ারকে দিয়ে তৈরি করিয়ে নিতে হবে। ছবিটা দেখলেই পরিষ্কার বুঝতে পারবে—কেমন করে জল আপনা-আপনি ফোয়ারার মত উপরের দিকে ছিটকে ওঠে। ডান দিকের নলটার মুখ একটা গ্লাসের মত করা হয়েছে। প্রথমে এখানে জল ঢেলে দিলে জলটা বাঁ-দিকের নলের নীচের ফাঁপা বলটা ভর্তি করে উপরের দ্বিতীয় বলটাকেও ভর্তি করবে। তারপর যন্ত্রটাকে আস্তে কাৎ করে নীচের বল থেকে জলটুকু ফেলে দাও।

উপরের বলটা জলে ভর্তি থেকে যাবে। নীচের বলটার মধ্যে এবার জল থাকবে না বটে, কিন্তু বাতাস থাকবে। এবার আবার ডান-দিকের নলের গ্লাসের মধ্যে খানিকটা জল ঢেলে দাও। জলটা নীচের দিকে নামতে থাকবে। ফলে নল ও নীচের বলের মধ্যকার বাতাসের উপর চাপ পড়বে। এই চাপ গিয়ে পড়বে আবার বাঁ-দিকের উপরের বলের ভিতরকার জলের উপর। বাতাসের এই চাপে উপরের বলের জল নলের সরু মুখ দিয়ে ফোয়ারার মত ছিট্‌কে উঠবে।

যন্ত্রটাকে কায়দামত একটু কাৎ করে ধরলেই ফোয়ারার মুখের জলটা বাইরে না পড়ে ডান-দিকের গ্লাসের মত পাত্রটার মধ্যে পড়বে। কাজেই নীচের বলটা ক্রমাগতই জলভর্তি হতে থাকবে এবং

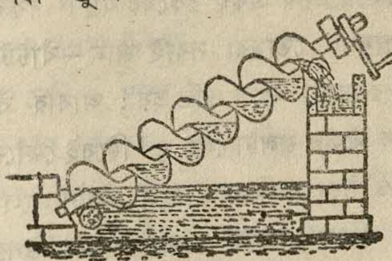


বাঁকানো নলের স্বয়ংক্রিয় ফোয়ারা

বাতাসের চাপে উপরের বলের জলটাও ফোয়ারার মত আপনা-আপনিই বেরিয়ে আসতে থাকবে।

আর্কিমিডিস্ স্ক্রু

তোমরা আর্কিমিডিসের নাম শুনেছ নিশ্চয়ই! খৃষ্টের জন্মের পূর্বে এত বড় বৈজ্ঞানিক আর জন্মগ্রহণ করেন নি। সে যুগে তিনি যে সব জিনিষ আবিষ্কার করে গেছেন, আজও আমরা সেগুলিকে কাজে লাগাচ্ছি। তাঁর আবিষ্কারের কাহিনীগুলি এতই অদ্ভুত যে, তোমরা শুনে কেবল বিস্মিতই নয়, মুগ্ধও হয়ে যাবে। এখানে কেবল তাঁর একটা সাধারণ আবিষ্কারের কথা বলছি—যেটা তোমরা অনায়াসেই করে দেখতে পার! নীচ থেকে উপরে জল তোলবার জন্যে আজকাল বিভিন্ন ধরনের পাম্প, বায়ু-চক্র প্রভৃতি অনেক রকমের যান্ত্রিক কৌশল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু সে যুগে এই ধরনের কোন যন্ত্রের কথা কেউ কল্পনাও করে নি। আর্কিমিডিস্ সে সময়ে উপরে জল তোলবার জন্যে এক অদ্ভুত যন্ত্র তৈরি করেন। যন্ত্রটা খুবই সরল। একটা সরু, লম্বা রড্—তার গায়ে চওড়া অথচ পাত্‌লা একখানা পাত, স্ক্রুর মত প্যাঁচে আগাগোড়া জড়ানো; অর্থাৎ জিনিষটা চওড়া প্যাঁচওয়ালা লম্বা একটা স্ক্রু। দু-মুখ খোলা একটা লম্বা নলের মধ্যে প্যাঁচওয়ালা লম্বা স্ক্রুটা ঢোকানো আছে। রডের এক মাথায়



আর্কিমিডিস্ স্ক্রু
নীচ থেকে উপরে জল তোলবার যন্ত্র

একটা হ্যাণ্ডেল আটকানো। হ্যাণ্ডেলের দিকটা উপরে রেখে নলটা হেলানোভাবে জলে বসিয়ে হ্যাণ্ডেল ঘোরালেই নীচের জল উপরে

এসে পড়তে থাকবে। চওড়া প্যাঁচওয়ালা এরূপ একটা লম্বা রড যোগাড় করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে; কাজেই এই পরীক্ষাটা করে দেখবার জন্যে তোমাদের আর একটা সহজ উপায় বলে দিচ্ছি। আশাকরি, এই পরীক্ষাটা তোমরা সবাই করে দেখতে পারবে। কাঠেরই হোক কি বাঁশেরই হোক, বেশ একটু মোটা, লম্বা লাঠির মত একটা জিনিষ যোগাড় কর। লম্বা লাঠির মত জিনিষটার একদিকে একটা হ্যাণ্ডেল লাগিয়ে নাও। মোটা ছিদ্রওয়ালা একটা রবারের নল স্ক্রুর প্যাঁচের মত করে লাঠির গায়ে জড়িয়ে আটকে দাও। হ্যাণ্ডেলটাকে উপরে রেখে এবার নল-জড়ানো লম্বা দণ্ডটাকে হেলানোভাবে জলের মধ্যে বসিয়ে হ্যাণ্ডেল ঘোরালেই নীচের জল উপরে এসে পড়তে থাকবে। ছবিটাকে ভাল করে দেখে নাও—ব্যাপারটা খুব সহজেই বুঝতে পারবে।

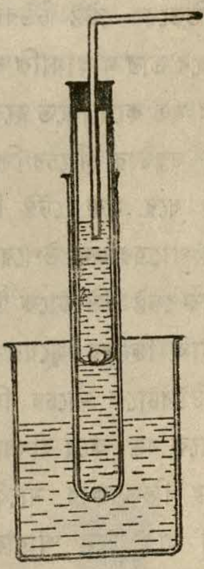
জল তোলার পাম্প

১.

পাম্প আর পিচ্‌কিরি প্রায় একই রকমের যন্ত্র। কিন্তু দুটো যন্ত্রের কাজ সম্পূর্ণ আলাদা। তোমরা সবাই জান—বাঁটটা উপরের দিকে টান্‌লে পিচ্‌কিরির নলটা জলে ভর্তি হয়; আবার বাঁটটাকে নীচের দিকে ঠেলে দিলে নলের জলটা সেই মুখ দিয়েই জোরে বেরিয়ে যায়। পাম্পের বাঁটটাও উপরের দিকে টান্‌লে নলটা জলে ভর্তি হয়, কিন্তু বাঁটটাকে নীচের দিকে ঠেললে নলের জলটা উপরের দিক দিয়ে বেড়িয়ে যায়। এজন্যেই নীচ থেকে উপরে জল তোলবার কাজে পাম্পের প্রয়োজন। কিন্তু কি কৌশলে পাম্পের সাহায্যে নীচের জল উপরে তোলা হয়, সে কথা তোমরা সবাই জান কি?

তোমরা নিজেরাই যাতে পরীক্ষা করে দেখতে পার, সে জন্যে একটা

সহজ কৌশলের কথা বলে দিচ্ছি। দুটো কাচের টেষ্ট টিউব যোগাড় করতে হবে—একটা মোটা আর একটা সরু। সরু টেষ্ট টিউবটা এমন মাপের হওয়া চাই যেন মোটা টেষ্ট টিউবটার মধ্যে বেশ সহজ-ভাবে ঢুকে যেতে পারে। সরু টেষ্ট টিউবটা মোটা টেষ্ট টিউবটার ঠিক গায়ে গায়ে লেগে ঢুকে গেলে বেশ কাজ হবে। এবার দুটো টেষ্ট টিউবেরই তলায় ছিদ্র করতে হবে। কাজটা খুব শক্ত নয়, গ্লাস-ব্লোয়ারকে দিলে সে ৫।৭ মিনিটের মধ্যেই টিউব দুটোর তলায় ছিদ্র করে দিতে পারে। নচেৎ তোমরা নিজেরাও করে নিতে পার। উপায়টা বলে দিচ্ছি। স্টোভ জ্বালিয়ে টেষ্ট টিউবের তলার দিকটা তার একটা সরু শিখার উপর রাখলেই দেখবে, টিউবের তলাটা লাল হয়ে উঠেছে। আরও একটু গরম কর। কাচটা খুবই নরম হয়ে যাবে। এবার টেষ্ট টিউবের খোলা মুখটা তোমার মুখে লাগিয়ে ফুঁ দাও। সঙ্গে সঙ্গেই তলার দিকটা ফুটো হয়ে বাতাস বেরিয়ে যাবে।



টেষ্ট টিউবের পাম্প

তারপর লাল থাকতে থাকতেই কোন কিছু একটা শক্ত জিনিষ দিয়ে চেপে টিউবের তলার দিকটা সমান করে নাও এবং টিউবটাকে আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হতে দাও। স্টোভের বদলে ব্লো-ল্যাম্প ব্যবহার করলে সুবিধা হবে। স্যাকরাদের বাঁক-নলের সাহায্যে কাজটা আরও ভালভাবে করা যেতে পারে! এবার সরু টেষ্ট টিউবটার মুখের মাপ মত একটা কর্কের ছিপি যোগাড় কর। ছিপিটার মধ্য দিয়ে একটা সরু ছিদ্র কর। ছিদ্রটার মধ্যে দু-মুখ খোলা সরু একটা কাচের নল

ঢুকিয়ে দাও। কাচের নলটাকে ছবির মত করে বাঁকিয়ে দিতে হবে। ছিদ্র করা সরু টেষ্ট টিউবটার মধ্যে ছোট্ট একটা সীসার বল বা মার্বেল রেখে নল-পরানো কর্কটাকে তার মুখে বেশ করে এঁটে দাও। ছিদ্রকরা মোটা টেষ্ট টিউবটার তলায়ও একটা সীসার বল বা মার্বেল রাখতে হবে। সরু টেষ্ট টিউবটা যদি মোটা টেষ্ট টিউবটার ভিতরের মাপের সমান হয় তবে তাকে মোটা টেষ্ট টিউবের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও। যদি ভিতরের টেষ্ট টিউবটা মোটা টেষ্ট টিউবটার চেয়ে অনেকটা সরু হয়, তবে তার মাঝামাঝি জায়গায় সুতা বা ন্যাকড়া জড়িয়ে পিচ্‌কিরির বাঁটের মত করে নিতে হবে। এই হলো তোমার সম্পূর্ণ যন্ত্র। এবার সম্পূর্ণ যন্ত্রটার নীচের দিকের খানিকটা অংশ এক পাত্র জলের মধ্যে ডুবিয়ে ধরে সরু টেষ্ট টিউবটাকে উপরে-নীচে ওঠা-নামা করলেই দেখবে পাত্রের জল উপরে উঠে বাঁকানো নলটা দিয়ে বেরিয়ে আসছে।

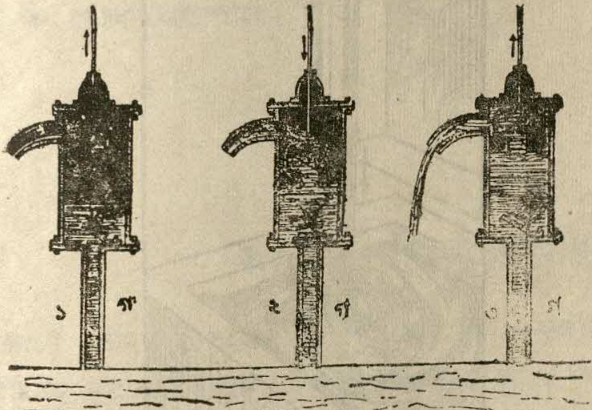
সরু টেষ্ট টিউবটাকে উপরে টানলেই দেখবে, পাত্রের জল মোটা টিউবটার ছিদ্রের মুখের মার্বেলটাকে ঠেলে ভিতরে ঢুকছে। এবার সরু টিউবটাকে নীচের দিকে চাপ দিলেই মার্বেলটা মোটা টিউবের ছিদ্রটাকে বন্ধ করে রাখবার দরুন জল বেরিয়ে যেতে না পেরে সরু টিউবের ভিতরকার মার্বেলটাকে ঠেলে তার ভিতরে ঢুকে যাবে। দ্বিতীয় বার টেনে আবার চাপ দিলেই বাড়তি জলটা বাঁকানো নল দিয়ে বেরিয়ে আসবে। মার্বেল দুটো জল ঢোকবার ও বেরিয়ে যাবার পথে কপাট বা ভাল্‌ভের কাজ করে। ছবিটা ভাল করে দেখে নিলেই ব্যাপারটা সহজে বুঝতে পারবে।

২০

এবার সত্যিকার কাজ চালাবার মত আসল পাম্প তৈরি করবার ব্যবস্থা বলে দিচ্ছি। যদি তোমাদের উৎসাহ থাকে, তবে একটু চেষ্টা করে অনায়াসে কাজ চালাবার মত একটা ফোর্স-পাম্প তৈরি করে নিতে পার। ছবিটা ভাল করে লক্ষ্য কর। এই ছবিটাতে একটা পাম্পেরই ১, ২, ৩ করে বিভিন্ন কার্যপন্থা দেখানো হয়েছে। একটা

লোহা বা পিতলের মোটা চোঙের নীচের দিকে গ-চিহ্নিত একটা পাইপ লাগানো আছে। পাইপটার শেষপ্রান্ত নীচু জায়গায় কোন পুকুর বা চৌবাচ্চার জলে ডুবনো থাকবে। চোঙটার উপরের দিকে এক পাশে রয়েছে জলের কলের মত একটা খোলা-মুখ নল। উপরে পিচ্‌কিরির বাঁটের মত একটা লম্বা বাঁট। বাঁটের নীচের প্রান্তে এঁটে দেওয়া হয়েছে বেশ পুরু একখানা চাক্‌তি। চাক্‌তিটার মধ্যস্থলে বেশ মোটা একটা ছিদ্র। ছিদ্রটার উপরে খ-চিহ্নিত পুরু এক টুক্‌রো চামড়া এক পাশে আঁটা রয়েছে। এক পাশে আঁটা থাকবার দরুন চামড়াটা কব্জা-আঁটা ডালার মত একটু উঁচু অথবা নীচু হতে পারে। চোঙের নীচের দিকে গ-চিহ্নিত নলটার মুখেও ক-চিহ্নিত এক টুক্‌রো পুরু চামড়া কব্জার মত আঁটা রয়েছে।

১ নম্বরে, বাঁটটাকে উপরের দিকে টানা হয়েছে। ফলে, খ-চিহ্নিত চামড়ার ডালাটা ছিদ্রের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে এবং ক-চিহ্নিত চামড়ার ডালাখানাকে উপরের দিকে ঠেলে দিয়ে পুকুরের জল গ-



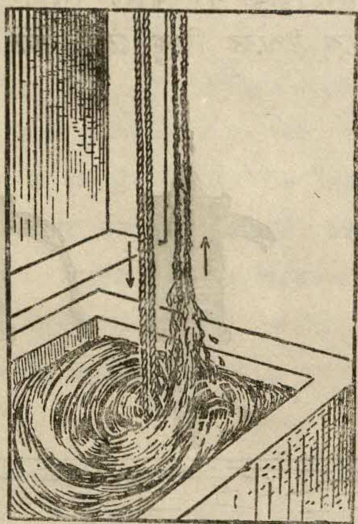
ফোর্স-পাম্পের কার্যপন্থা দেখানো হয়েছে

চিহ্নিত নল দিয়ে চোঙের মধ্যে ঢুকছে। ২ নম্বরে, বাঁটটাকে নীচের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। ফলে ক-চিহ্নিত চামড়ার ডালাখানা নলের

মুখ বন্ধ করে দিয়েছে এবং খ-চিহ্নিত ডালাখানাকে খুলে জল উপরে উঠে যাচ্ছে। ৩ নম্বরে, বাঁটটাকে পুনরায় উপরের দিকে টানা হচ্ছে। ফলে চাক্‌তির উপরের জলটা পাশের নল দিয়ে বাইরে এসে পড়ছে। চামড়ার ডালার বদলে বড় মার্বেলও ব্যবহার করতে পার। কোন রকমে টিউবওয়েলের পাম্প বা ষ্টিরাপ পাম্প খোলা অবস্থায় দেখতে পারলে ব্যাপারটা আরও সহজে বুঝতে পারবে।

দড়ির সাহায্যে জল তোলা

পাম্পের সাহায্যে উপরে জল তোলা হয়, একথা তোমরা সবাই জান। কিন্তু পাম্প ছাড়াও যে দু-গাছা দড়ির সাহায্যে উপরে জল



দড়ির সাহায্যে জল তোলা

তোলা যায়, সেটা তোমরা অনায়াসেই পরীক্ষা করে দেখতে পার ধর, ২৫ ফুট উঁচুতে ছোট একটা মোটর বসানো হয়েছে। মোটরের

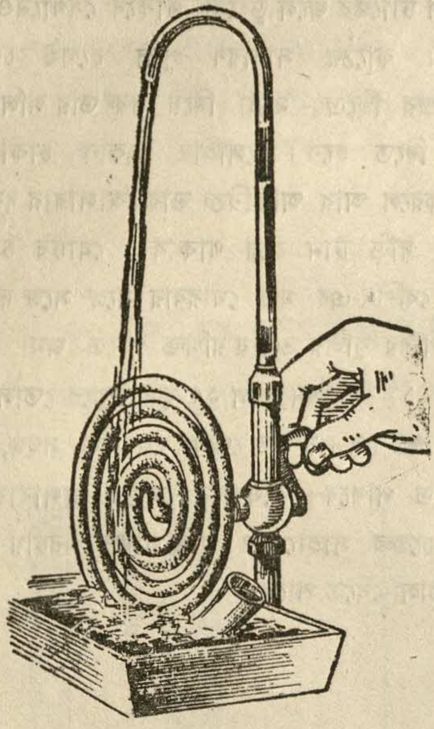
পুলির সঙ্গে ছু-গাছা মাঝারি গোছের মোটা দড়ি বেল্টিং-এর মত করে নিচের জলের ট্যাঙ্কের মধ্যে ঝুলিয়ে দিতে হবে। দড়ি ছু-গাছার যে অংশ ট্যাঙ্কের জলে ডুবনো থাকবে সেখানেও একটা পুলি ঝুলিয়ে দাও। কাঠের সাধারণ পুলি হলেই চলবে। নিচের পুলিটার কেন্দ্রের ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে সরু তার গলিয়ে একটা কিছু ভার ঝুলিয়ে দিতে হবে। লোহার একটা চাকা পুলির মত করে ব্যবহার করলে আর অতিরিক্ত ভার ঝোলাবার দরকার হবে না ; পুলির ভারেই দড়ি টান হয়ে থাকবে। মোটর চালিয়ে দিলেই দড়ি ছু-গাছা বেল্টিং-এর মত ঘোরবার সঙ্গে সঙ্গে দড়ির ফাঁকে জল উপরে উঠে উপরের পুলির তলায় রক্ষিত পাত্রে জমা হবে। এভাবে মিনিটে প্রায় ১২ গ্যালন জল ২৫ ফুট উপরে তোলা যেতে পারে। পাম্পের চেয়ে এই ব্যবস্থায় জল তোলা যে কত সহজ, পরীক্ষা করে দেখলেই বুঝতে পারবে। যেখানে মোটর চালাবার সুবিধা নেই, সেখানে বায়ু-চক্রের সাহায্যেও অতি সামান্য খরচায় বিভিন্ন উদ্দেশ্যে উপরে জল তোলা যেতে পারে।

সহজ কৌশলে জলের কল

এর আগে তোমাদের সহজ কৌশলে উপরে জল তোলবার জন্যে আর্কিমিডিস স্ক্রুর কথা বলেছি। এবার সে যন্ত্রেরই আরও কিছু উন্নত ধরনের ব্যবস্থার কথা বলছি। এই যন্ত্রটাও তোমরা অনায়াসে তৈরি করতে পার। প্রথমে ছবিটা ভাল করে দেখে নাও। ছবি থেকেই যন্ত্রের কৌশল বুঝতে পারা যাবে।

প্রথমে ডানদিকের মাথা বাঁকানো খাড়া নলটার মত একটা

লোহা বা পিতলের পাইপ যোগাড় কর। ওই পাইপটার গোড়ার দিকে, সাধারণ জলের কলের মুখের মত, মাঝের গোল জায়গাটায়



একটা ট্যাপ জুড়ে দিতে হবে। এই গোল অংশটার ভিতর দিয়ে প্রায় আড়াই ইঞ্চি লম্বা অথচ সরু একখণ্ড পাইপের টুক্‌রো ঢুকিয়ে তার এক মুখ বন্ধ করে অপর মুখ খোলা রেখে দাও। এই ছোট্ট পাইপের টুক্‌রোটা, খাড়া পাইপটার গোলাকার স্ফীত স্থানটার ভিতর দিয়ে এমনভাবে বসাতে হবে যে, তার কোথাও একটু ফাঁক থাকবে না অথচ বেশ সহজভাবে ঘুরতে পারবে। এই টুক্‌রো পাইপের যে অংশটুকু খাড়া পাইপটার স্ফীত অংশের ভিতরে থাকবে, সেখানে তার গায়ে এফোঁড়-ওফোঁড় চারটি মোটা ছিদ্র করে দিতে হবে। টুক্‌রো পাইপটার বন্ধ মুখে একটা হ্যাণ্ডেল জুড়ে দাও। হ্যাণ্ডেল ঘোরালে

এই ছোট্ট পাইপটাও ঘুরবে। এবার একটা রবারের নল যোগাড় করে সেটাকে ছবির নলের মত কুণ্ডলী করে তার ভিতরের দিকের মুখটা ওই ছোট্ট পাইপটার খোলা মুখে এঁটে বসিয়ে দাও। নলের কুণ্ডলীটাকে ঠিকভাবে রাখবার জন্যে ব্যবস্থা করতে হবে। রবারের নলের কুণ্ডলীর পরিবর্তে ধাতুনির্মিত নলও ব্যবহার করতে পার। যন্ত্রটাকে সুবিধামত জায়গায় এমনভাবে বসাও যেন নলের কুণ্ডলীটার কিছুটা জলে ডুবে থাকে। হ্যাণ্ডেল ঘোরালেই নলের কুণ্ডলীটাও ঘুরতে থাকবে। হ্যাণ্ডেলের সাহায্যে নলের কুণ্ডলীটাকে সামনের দিকে ঘোরাতে থাকলে জল কুণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে খাড়া পাইপের পথে উপরে গিয়ে পড়তে থাকবে।

উপর থেকে জলের নীচে দেখবার কৌশল

উপর থেকে খুব পরিষ্কার অগভীর জলের তলা অবধি দেখা যেতে



১নং ছবি

উপর থেকে জলের নীচে দেখবার ব্যবস্থা

পারে। কিন্তু একটু বেশী গভীরতায় বা অপরিষ্কার জলের নীচে থেকে কিছুই দেখা যায় না। উপর থেকে জলের নীচে যাতে সব কিছু

পরিষ্কারভাবে দেখা যেতে পারে, এমন একটা সহজ কৌশলের কথা বলছি। ইচ্ছা করলে তোমরা অতি সহজে এই জিনিসটা তৈরি করে জলের নীচে মাছের গতিবিধি এবং জলজ উদ্ভিদ প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করতে পার। জিনিসটা বিশেষ কিছুই নয়—খুব পাত্‌লা কাঠের লম্বা একটা চৌকো বাক্স মাত্র। লম্বা বাক্সটার তলার দিকে একখানা চৌকো কাচ আঁটা। আর উপরের দিকে থাকবে খাটো একটা ডিম্বাকৃতি চোঙ, যার ভিতর দিয়ে এক সঙ্গে দু-চোখে দেখতে পারা যায়।



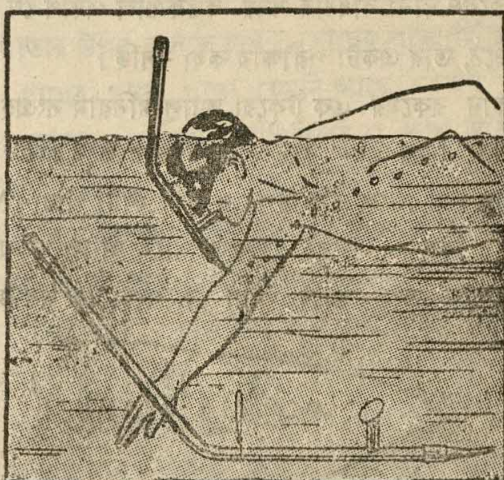
২নং ছবি

বাক্সটা কেমন করে তৈরি করতে হবে, তার ব্যবস্থা দেখানো হয়েছে

শিরিষের আঠা দিয়ে পাত্‌লা কাঠ জুড়ে লম্বাটে একটা বাক্স তৈরি কর। ২নং ছবির মত করে নীচের দিকে একখানা কাচ এমন ভাবে জুড়ে দাও যেন জলে ডুবিয়ে ধরলেও ভিতরে জল ঢুকতে না পারে। বাক্সের উপরের দিকের কাঠখানায় ডিমের মত গোল করে বেশ বড় একটা ছিদ্র কর। তার-পর একখানা টিনের পাত গোল করে ওই ছিদ্রের মুখে একটু উঁচু কানার মত করে বসিয়ে দাও। টিনের এই উঁচু কানাটায় চোখ রেখে দেখবার জন্যে পাত্‌টার উপরের ধারে একটু পুরুভাবে কাপড় বা রবারের প্যাড দিয়ে মুড়ে দিতে হবে এবার ১নং ছবিতে যেমন আছে, তেমনি ভাবে বাক্সটাকে জলের নীচে অর্ধেকটা ডুবিয়ে রেখে চোঙটাতে চোখ লাগিয়ে জলের তলায় দেখতে হবে।

ডুবুরি নল

যারা বেশ কিছুক্ষণ ধরে ডুব-সাঁতার কাটতে চাও বা জলের খানিকটা নিচে ডুবে থাকতে চাও, তারা ছবির মত এক রকমের চোঙ বা নল ব্যবহার করতে পার। জলে ডুবে থেকেও স্বচ্ছ প্লাষ্টিকের হাল্কা নলের সাহায্যে অনায়াসে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া চালানো যেতে পারে। ছবিটি লক্ষ করলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। বাঁকানো নলটার নীচের



উপরে—ডুবুরি নল ব্যবহারের কৌশল দেখানো হয়েছে ;
নীচে—ডুবুরি নল

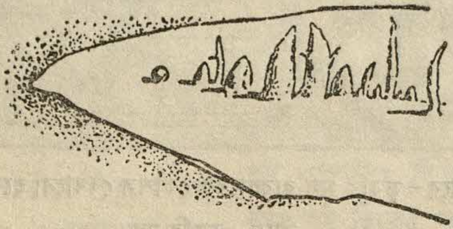
বাহুর এক পাশ থেকে ছোট্ট আর একটা নল বেরিয়েছে। ফিতা দিয়ে নলটা মাথার সঙ্গে আট্‌কে রেখে পাশের ছোট নলটাকে মুখে রাখতে হবে। নলের নীচের প্রান্তে বাইরের দিকে একটা ভাল্‌ভ এবং উপরের প্রান্তে ভিতর দিকে একটা ভাল্‌ভ আছে। নলের উপরের দিকটা জল ছেড়েও বেশ খানিকটা উপরে থাকবে। শ্বাস নেবার সময় উপর থেকে মুখের মধ্যে বাতাস ঢুকবে—আর নলের

নীচের মুখ দিয়ে প্রশ্বাসের বাতাস বেরিয়ে যাবে। প্লাষ্টিকের নল যোগাড় করে তোমরা এটা পরীক্ষা করে দেখতে পার।

অ্যালুমিনিয়ামের উপর ক্রমবর্ধমান ছত্রাকের মত পদার্থ

জীবন্ত না হয়েও দানা বাঁধবার সময় কতকগুলি পদার্থ যে সজীব বস্তুর মত বেড়ে ওঠে, তার একটা পরীক্ষার কথা বলছি।

যে কোন রকমের এক টুক্‌রো অ্যালুমিনিয়াম সংগ্রহ করে তাকে শিরিষ কাগজ দিয়ে বেশ করে ঘষে পরিষ্কার করে নাও। টুক্‌রোটা বেশ পরিষ্কার হয়ে গেলে তার উপর দু-এক ফোঁটা পারা (Mercury) ঘষে দাও। কিছুক্ষণ পরেই দেখতে পাবে অ্যালুমিনিয়াম টুক্‌রোর যেখানে যেখানে ভাল ভাবে পারা লেগেছে, সে সব জায়গা থেকে



পারা-সংযোগে অ্যালুমিনিয়াম পাতের উপর ছত্রাকারের মত পদার্থ গজিয়ে উঠছে

কোমল পশমের মত সাদা একরকম পদার্থ বেরিয়ে আসছে। চোখের সামনেই দেখতে দেখতে সেগুলি ক্রমশ লম্বায় বেড়ে যাবে। কোন কোনটা আধ ইঞ্চিরও বেশী বড় হয়ে উঠবে। আসলে জীবন্ত না হলেও এই বাড়ন্ত পদার্থগুলিকে এক রকম ব্যাঙের ছাতার মত সজীব উদ্ভিদ বলেই মনে হবে।

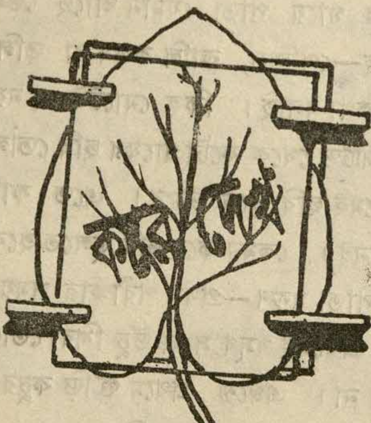
গাছের পাতায় ফটোগ্রাফী

কাগজের উপর যেমন ফটোগ্রাফের ছবি তোলা হয়, গাছের পাতার উপরেও ঠিক তেমনি করে ছবি তোলা যেতে পারে তোমাদের অনেকেই হয়তো কথাটা বিশ্বাস করতে চাইবে না। কিন্তু উপায়টা বলে দিচ্ছি—ধৈর্য ধরে একটু চেষ্টা করে দেখো, সবাই একাজে সাফল্য লাভ করতে পারবে।

যে-কোন রকম হাতে-আঁকা ছবি, হাতের লেখা বা ফটোগ্রাফের ছবি গাছের পাতার উপর তুলতে হবে। গাছের পাতা ছিঁড়ে নেবার দরকার নেই, গাছের গায়ে পাতা যেমনি আছে তেমনি থাকবে। তোমরা হয়তো ভাবছ—পেন্সিল, কালি-কলম বা তুলি দিয়ে পাতার উপর ছবি তোলবার কথা বলছি। কিন্তু মোটেই তা নয়। কাগজের উপর যেমন করে নেগেটিভ থেকে ফটোগ্রাফের ছবি তোলা হয়, পাতার উপরও ঠিক সেই রকমেই ছবি ফুটে উঠবে। এতে কালি, কলম বা রং-তুলির প্রয়োজন নেই। কেমন করে ছবি তুলতে হবে বলছি—

যে সব গাছের পাতা মসৃণ—প্রথম পরীক্ষার সময় সে সব গাছই বেছে নেবে। কারণ প্রথমেই খস্‌খসে বা উঁচু শিরা তোলা পাতা নিয়ে সুবিধা করতে পারবে না। এজন্যে প্রথমে গুঁড়ি কচুর পাতা, ক্যানা-ফুল বা ট্রপিউলাম প্রভৃতির পাতা বেছে নিতে হবে। তাছাড়া ছবি তোলবার জন্যে এমন জায়গার পাতাই বেছে নেওয়া দরকার, যেগুলি সারা দিনই কিছু না কিছু আলো পায়। আবার খুব কড়া রোদ হলেও প্রথম প্রথম সুবিধা করতে পারবে না। এখন ছোট ছোট দুখানা সাদা কাচ সংগ্রহ করে বেশ পরিষ্কার করে নেবে। কাচ দুখানা চার ইঞ্চি চৌকো বা তার চেয়ে ছোট হলেও চলবে। একখানা কাচের উপর চাইনিজ ইঙ্ক বা ওই রকমের কোন ঘন কালো কালি দিয়ে যে কোন রকম ছবি আঁক বা নাম সই কর। কিছুক্ষণ রোদে রাখলেই

কালিতে আঁকা ছবি বা লেখাটা শুকিয়ে যাবে। যে পাতাটার উপর ছবি বা তোমার নাম তোলবার ইচ্ছা, সে পাতাটার উপর নাম সই-করা বা ছবি-আঁকা কাচখানা চাপা দাও। আঁকা দিকটা উপরে থাকবে। অপর সাদা কাচখানাকে পাতাটার নীচে রেখে কাঠের ছোট ছোট ক্লিপ দিয়ে পাতাসমেত উপর ও নীচের কাচ ছুখানা এমনভাবে চেপে রাখ যেন উপরের কাচ ও পাতার মধ্যে কোন ফাঁক না থাকে, অথচ পাতাটাও জখম না হয়। কাচের ভারে পাতাটা যাতে ছিঁড়ে না পড়ে, তার ব্যবস্থাও করতে হবে। কয়েক ঘণ্টা রোদ পাবার পর কাচ ছুখানা খুলে ফেললেই দেখবে—পাতার গায়ে তোমার আঁকা ছবি বা নাম অবিকল ফুটে উঠেছে।



পাতাটার উপরে ও নীচে ছুখানা চৌকো কাচ কাঠের ক্লিপ দিয়ে এঁটে দেওয়া হয়েছে। উপরের কাচখানার উপরের দিকে চাইনিজ-ইঙ্ক দিয়ে 'করে দেখ' লেখা রয়েছে

কোন্ পাতায় কতক্ষণ রোদ লাগানো দরকার সেটা তোমরা পরীক্ষা করে ঠিক করে নেবে। কোন কোন অবস্থায় হয়তো কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ছবি ফুটে উঠবে; কোনটাতে আবার একদিন-ছুদিনও লাগতে পারে। ফটোগ্রাফের যে কোন একখানা নেগেটিভ এভাবে

পাতার উপর চাপিয়ে দিলেও দেখবে, ফটোগ্রাফের ছবিটি পাতার উপর ফুটে উঠেছে। কিন্তু লক্ষ রাখবে, রোদ খুব কড়া না হয়। কড়া রোদে কাচ তেতে গিয়ে পাতাটাকে ঝল্‌সে দিতে পারে। কাচ ছাড়া যে কোন স্বচ্ছ জিনিসে ছবি এঁকেও এভাবে পাতার গায়ে তার ছাপ তোলা যেতে পারে। একটু পুরু কালো কাগজে নক্সা কেটে নিয়ে তাকে পাতার উপর বসিয়ে দিলেও কিছুক্ষণ রোদ পাবার পর হুবহু সেই নক্সা পাতার গায়ে ফুটে উঠবে।

ব্যাপারটা কেমন করে ঘটে মোটামুটি একটু বুঝিয়ে বলছি। ঘাসের উপর ইট বা কোন কিছু পদার্থ চেপে থাকলে কিছুকাল পরে তুলে ফেললে দেখা যায়—চাপা-পড়া ঘাসগুলি সম্পূর্ণ সাদা হয়ে গেছে তার মানে, রোদ না পেলে গাছের পাতার সবুজ রঙটা তৈরি হয় না। কাচের গায়ে কালো কালিতে ছবি আঁকার ফলে কালির রেখাগুলির ভিতর দিয়ে পাতার গায়ে রোদ পড়তে পারে না। কাজেই যে জায়গাটায় রোদ পড়ে, সেটা বেশ সবুজই থাকে কিন্তু রোদ না-পাওয়া জায়গাগুলি ক্রমশ ফ্যাকাসে হতে থাকে। এ-কারণেই সবুজ পাতার উপর ফ্যাকাসে বা ফিকে সবুজ রঙের ছবি দেখা যায়।

আয়োডিন সলিউশনে ডুবিয়ে অবশ্য এই ছবিগুলিকে ফটোগ্রাফের ছবির মত স্থায়ী করা যায়; কিন্তু তাতে পাতাটাকে জীবন্ত অবস্থায় রাখা চলে না। অবশ্য অতটা না করেও তোমরা সোজাসুজি পাতার গায়ে ছবিটাকে ফুটিয়ে তোলবার পরীক্ষাটা করে দেখতে পার।

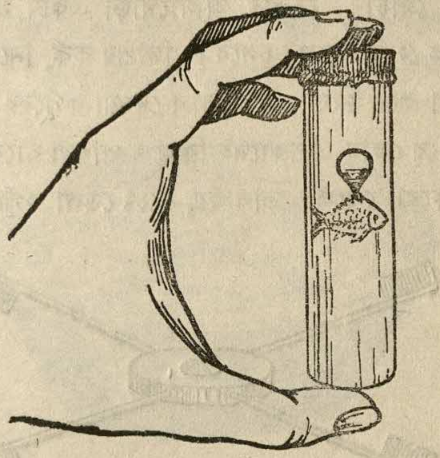
ডুবুরি মাছ

তোমরা লক্ষ করে থাকবে—অনেক মাছেরই পেটের ভিতরে শিরদাঁড়ার নীচে বাতাসভর্তি একরকম পট্‌কা থাকে। ইংরেজীতে এটাকে বলে—'সুইমিং ব্লাডার'। মাছ তার পেশীর সাহায্যে এই

পট্‌কাকে সংকুচিত বা প্রসারিত করে ইচ্ছামত ডুবে যেতে পারে অথবা ভেসে থাকতে পারে। খুব সহজ একটা পরীক্ষায় তোমরা এই ধরনের ব্যাপার প্রত্যক্ষ করতে পার।

বড় মার্বেলের মত একটা ফাঁপা কাচের বল যোগাড় কর। গ্লাস-ব্লোয়ারদের কাছে এ রকমের অনেক বাতিল কাচের বল পাবে। অথবা তাদের দিয়ে অনায়াসেই এরকমের একটা ফাঁপা বল তৈরি করে নিতে পার। বলটার তলার দিকে বোঁটার মত একটু অংশ থাকবে। ওই বোঁটার পাশে, অর্থাৎ বলের নীচের দিকে ছোট্ট একটা ফুটো রাখতে হবে। কাচ দিয়েই হোক বা প্লাস্টেসিন দিয়েই হোক, ছোট্ট একটা মাছ তৈরি করে কাচের বলটার বোঁটার সঙ্গে ছবির মত করে জুড়ে দাও। এছাড়া একটা কাচের গ্যাস-জার অথবা মোটা টেস্ট টিউব যোগাড় করতে হবে। গ্যাস-জার বা টেস্ট টিউব না পেলে মোটা-মুখ, খাটো গলাওয়ালা বোতলেও কাজ চলবে। বোতলে অথবা গ্যাস-জারের প্রায় গলা অবধি জল ভর্তি করে তাতে কাচের বল সংলগ্ন মাছটাকে ছেড়ে দাও। ফাঁপা বলটা জলের উপরে অনেকটা ভেসে থাকবে। ড্রপারের সাহায্যেই হোক, কি জলের কলের নীচে ধরেই হোক—বোঁটার পাশের ফুটোর ভিতর দিয়ে বলটার মধ্যে খানিকটা জল ভর্তি করে আবার সেটাকে জলে ছেড়ে দাও। যদি জল বেশী ভর্তি হয়ে থাকে তবে মাছ সমেত বলটা এবার ডুবে গিয়ে জলের তলায় চলে যাবে। ডুবে গেলে ঝাঁকুনি দিয়ে বল থেকে খানিকটা জল বের করে এমন অবস্থায় আনবে যাতে বলটা জলের উপর সামান্য একটু মাত্র ভেসে থাকে। বোতল বা জারের মুখে এবার একটা রবারের পাত বেঁধে বা রবারের ছিপি এঁটে দিয়ে তাতে জোর করে একটু চাপ দিলেই দেখবে—বল-সংলগ্ন ভাসমান মাছটা জলের তলায় ডুবে যাবে। চাপ ছেড়ে দিলেই মাছটা আবার জলের উপর ভেসে উঠবে! ছিপির উপর চাপ দিলে বোতলের বাতাসের উপর চাপ পড়ে। সেই চাপে খানিকটা জল ফুটো দিয়ে ফাঁপা বলটার

ভিতরে ঢুকে যায়। জল ঢোকবার ফলে বলটা আগের চেয়ে খানিকটা ভারী হয় বলেই জলের নীচে তলিয়ে যায়। চাপ ছেড়ে দিলেই সেই জলটুকু আবার বেরিয়ে আসে এবং মাছসমেত বলটাও জলের উপর ভেসে ওঠে।



কাচের টিউবটাকে কেমন করে আঙুলে চেপে ধরতে হবে, ছবিতে তাই দেখানো হয়েছে

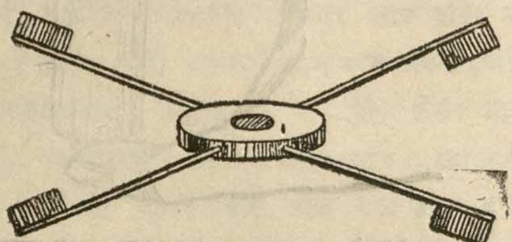
তোমার বন্ধুদের কাছে পরীক্ষাটা দেখাবার সময় মাছটাকে ডুবতে বললেই ডুবে যাবে; আবার ভাসতে বললেই ভেসে উঠবে। এই সঙ্গে দেওয়া ছবির মত ব্যবস্থায় জিনিসটাকে করে দেখো—অজানা লোকেরা দেখে ভাববে—মাছটা যেন তোমার কথামতই ওঠানামা করছে!

ঘূর্ণায়মান জলচক্র

এই পরীক্ষাটা খুবই সহজ। এর উপকরণ সংগ্রহ করতে তোমাদের কিছুমাত্র অসুবিধা ভোগ করতে হবে না। একটু মনোযোগ দিয়ে

দক্ষতার সঙ্গে করতে পারলে প্রত্যেকেই আশ্চর্য রকম সফলতা লাভ করবে।

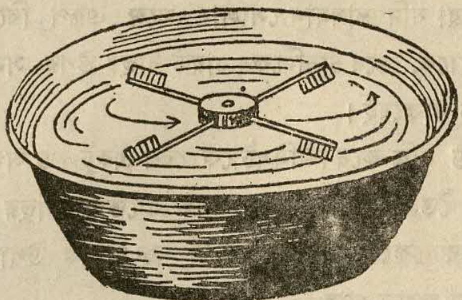
প্রথমে একখণ্ড সোলা বা কর্ক্ এবং চাপ-দেওয়া কর্পূরের চৌকো টুকরো সংগ্রহ করতে হবে। সোলার গাছ হয়—সাধারণ একটা লাঠির মত মোটা। ভিতরে আগাগোড়া একটা সরু ছিদ্র আছে। এক এক চাক সোলা হলেই চলবে। ছিপির কর্ক্ নিলে তার মধ্যস্থলে একটা ফুটো করে নিতে হবে। চাপ-দেওয়া কর্পূরের চৌকো ব্লক বা তার টুকরো যে কোন দোকানেই কিনতে পাওয়া যাবে। এই ধরনের কর্পূরের টুকরো পেলেই ভাল হয়, নচেৎ ডেলা কর্পূরেও কাজ চলতে



সোলার চাক্‌তির গায়ে বসানো কাঠির মাথার একদিক করে কর্পূরের টুক্‌রো এঁটে দেওয়া হয়েছে

পারে। অবশ্য এই সকল পরীক্ষার বেশীর ভাগই তোমাদের বুদ্ধি-কৌশল এবং দক্ষতার উপর নির্ভর করে। পাঁচ-ছটা পয়সা এক থাকে সাজিয়ে রাখলে যতটা পুরু হয় ততটা পুরু করে এক চাক সোলা খুব ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে নাও। একটা দেশলাইয়ের কাঠি লম্বালম্বি চার ভাগে চিরলে চারখানা খুব সরু কাঠি হবে। দেশলাইয়ের কাঠির বদলে ওই রকমের সরু চারখানা বাঁশের চোঁচ অথবা সূচ বা অন্য যা কিছু একটা হলেই কাজ চলবে। ওই রকম চারখানা কাঠির একমুখ ছুঁচলো করে নিয়ে সোলার চাকতিটার গায়ে চারদিকে সমান দূরে দূরে বেশ একটু শক্ত করে বসিয়ে দাও। সোলার চাক্‌তি যতটা পুরু করে কেটেছ, ঠিক ওই রকম পুরু আর চারখানা

সোলার ছোট্ট চৌকো কেটে নিয়ে চাক্‌তিটার গায়ে বসানো কাঠির মাথায় ঢুকিয়ে বসিয়ে দাও। জিনিসটা দেখতে একটা চর্কির মত হবে। এবার কর্পূরের ব্লক থেকে ছোট্ট চারখানা লম্বাটে বা চৌকো টুকরো কেটে বের কর। সহজে জলে গলে না যায়, এরূপ সামান্য একটু ভালো আঠা দিয়েই হোক বা পাত্‌লা করে মোম লাগিয়েই হোক, কর্পূরের চ্যাপ্টা টুক্‌রোগুলিকে কাঠির মাথায় আটকানো সোলার



গামলার জলে সোলার চর্কিটা ঘুরছে

টুক্‌রোর গায়ে একদিক করে এঁটে দাও। কর্পূরের টুক্‌রোগুলি যেন একটায় এধারে, আর একটায় ওধারে লাগানো না হয়। বাঁদিক ধরেই হোক কি ডান-দিক ধরেই হোক, কর্পূরের ফালিগুলি সোলার চর্কিটার চারটে বাহুতে একদিক করে লাগাতে হবে। ছবিটা ভাল করে দেখে নাও তবেই পরিষ্কার বুঝতে পারবে। সোলার চর্কিটাকে যতদূর সম্ভব হাল্কা আর চারদিক সমভার করবার জন্যে বিশেষ নজর রাখবে। এবার হয় একটা বড় গামলা, না হয় চৌবাচ্চা বা পুকুরের জলের উপর চর্কিটাকে আস্তে ছেড়ে দাও। দেখবে, হাওয়ায়-ঘোরা চর্কির মত এই চর্কিটাও জলের উপর পাক খেয়ে ঘুরতে শুরু করেছে এবং অনেকক্ষণ ধরে অনবরত ঘুরতেই থাকবে। কর্পূরের পরিবর্তে ভাল সাবান দিয়েও এই পরীক্ষা করা যেতে পারে। গামলার তলায় জলের নীচে মোম বা প্ল্যাস্টেসিন দিয়ে একটা সরু কাঠি বসিয়ে দাও

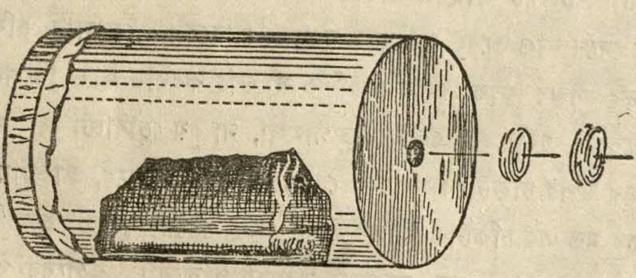
কাঠিটা যেন জলের উপর খানিকটা বেরিয়ে থাকে। সোলার ফুটোর মধ্যে দিয়ে ওই কাঠিটা গলিয়ে দিলে এক জায়গায় থেকেই চর্কিটা চাকার মত ঘুরতে থাকবে।

ব্যাপারটা বিশেষ কিছুই নয়। জলের উপর কর্পূরের গুঁড়া বা পাত্‌লা এক টুকরো সাবান অথবা এক ফোঁটা তেল ছড়িয়ে দিয়ে দেখো, ব্যাপারটা কি হয়। কর্পূর বা সাবান থেকে কোন পদার্থ যেন ভয়ানক বেগে জলের মধ্যে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে—দেখতে পাবে। কর্পূরের টুকরো যদি ভাসমান সোলার সঙ্গে এরূপ বিশেষ কৌশলে আটকানো থাকে, তবে চারদিকের চারটি বাহুর উপর সমবেত ধাক্কায় চর্কিটা ঘুরতে থাকবেই।

যদি কেউ বুদ্ধি করে জিনিসটাকে বেশ একটু বড় অথচ হাল্কা করে নিখুঁতভাবে তৈরি করতে পার, তবে প্রত্যেক বাহুর উপর হাল্কা কাগজের ছবি কেটে দাঁড় করিয়ে বা অন্য অনেক উপায়ে চিত্তাকর্ষক খেলার ব্যবস্থা করতে পার।

ধোঁয়ার অঙ্গুরী

একটা টিনের কৌটো যোগাড় কর। কৌটোর তলার দিকটায় প্রায় আধ ইঞ্চি গোলাকার পরিষ্কার একটা ছিদ্র করতে হবে, অর্থাৎ গোলের

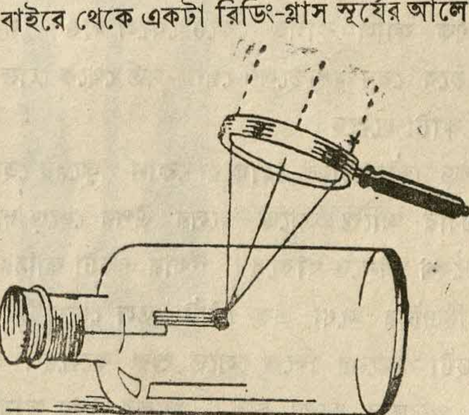


টিনের কৌটোর তলার ছিদ্র, কাগজ মোড়বার কায়দা এবং জ্বলন্ত সিগারেট রাখবার ব্যবস্থা দেখানো হয়েছে

ধারটা যেন মসৃণ হয়। কৌটোটাকে বেশ করে শুকিয়ে নিয়ে খোলা মুখটাতে শক্ত একখণ্ড পাত্‌লা কাগজ মুড়ে কৌটোর গায়ে সূতা দিয়ে বেঁধে দাও। জ্বলন্ত একটা সিগারেটের ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে ফেলে দিলে কিছুক্ষণের মধ্যেই কৌটোটা ধোঁয়ায় ভরে উঠবে। এবার ঢাকনা কাগজখানার উপর একটু একটু করে চাপ দিলে বা আস্তে আস্তে ধাক্কা দিলে ছিদ্রের মধ্য দিয়ে এক-একটা করে ধোঁয়ার অঙ্গুরী বেরিয়ে আসবে।

দেশলাই-বন্দুক

দু-চারটা দেশলাই কাঠির বারুদের বিপরীত দিকটা, পিন দিয়ে একটা কর্কের পিছন দিকে এঁটে দাও। কর্কটাকে একটা বোতলের মুখে এঁটে দিলে দেশলাইয়ের কাঠিগুলি থাকবে বোতলের মধ্যে। বোতলটাকে শুইয়ে রেখে বাইরে থেকে একটা রিডিং-গ্লাস সূর্যের আলোয় এমনভাবে



বোতলের মধ্যে দেশলাইয়ের কাঠি রেখে রিডিং গ্লাসের ভিতর দিয়ে আলো ফেলা হচ্ছে

ধর যেন সংহত আলোক-বিন্দুটা গিয়ে কাঠির বারুদের উপর পড়ে আলোক-বিন্দুটা পড়বার কিছুক্ষণের মধ্যেই কাঠিগুলিতে আগুন ধরে

যাবে। আগুনের উত্তাপে ভিতরের আবদ্ধ বাতাস প্রসারিত হবার ফলে বন্দুকের মত আওয়াজ করে বোতলের মুখের কর্কটা ছিটকে বেরিয়ে যাবে।

কাগজের চলন্ত মাছ

সহজ একটা মজার পরীক্ষার কথা শোন। এই পরীক্ষাটা তোমরা প্রত্যেকে অনায়াসেই করতে পারবে। পোস্টকার্ডের মত পুরু এবং মসৃণ একখণ্ড কাগজ নাও। কাঁচি দিয়ে কেটে একটা মাছের মত তৈরি কর। মাছটার শরীরের প্রায় মধ্যস্থলে একটা ছিদ্র করতে হবে। ছিদ্রটা পেন্সিলের মত মোটা হলেই চলবে। এবার মাছটার লেজের মধ্য দিয়ে গোলাকার ছিদ্রটা পর্যন্ত সোজাসুজি খানিকটা ফাঁক করে সরু এক ফালি কাগজ কেটে ফেলে দাও। মাছটাকে এখন দেখে মনে হবে যেন মধ্যস্থলের গোল গর্ত থেকে লেজ পর্যন্ত সোজা একটা নালা কাটা হয়েছে।

কোন বড় চৌবাচ্চায়ই হোক বা কোন পুকুরেই হোক কাগজের মাছটাকে এবার আস্তে আস্তে জলের উপর ছেড়ে দাও। মাছটা জলের উপর বেশ ভাসতে থাকবে। এবার একটা কাঠির ডগায় করে গোলাকার ছিদ্রটার মধ্যে এক ফোঁটা তেল ছেড়ে দিলেই দেখবে—কাগজের মাছটা সামনের দিকে চলতে শুরু করেছে। লক্ষ রেখ—জলটা বেশ পরিষ্কার হওয়া চাই। জলের উপর সামান্য সরের মত পদার্থ থাকলেও পরীক্ষায় ফল হবে না। যদি চৌবাচ্চার জলের পরীক্ষা করতে চাও, তবে প্রথমবার পরীক্ষার পর চৌবাচ্চার জলের উপর তেল ছড়িয়ে পড়লে সেটাকে তুলে না ফেলা পর্যন্ত সেখানে দ্বিতীয় বার পরীক্ষা করা মুশ্‌কিল হবে। কাজেই পুকুরের জলে বা

ট্রের মত কোন অগভীর পাত্রে জল রেখে পরীক্ষা করাই ভাল। ট্রের জলে একবার তেল ছড়িয়ে পড়লে তা ফেলে দিয়ে আবার জল ভর্তি করে পরীক্ষা করা চলে।

কেন এমন হয়? পরীক্ষাটা করে দেখলেই সেটা বুঝতে পারবে। জলের উপর এক ফোঁটা তেল ফেলে দিলে দেখবে, সেটা তৎক্ষণাৎ পাত্‌লা সরের মত ছড়িয়ে পড়ে। কাগজের গোলাকার ছিদ্রটা খুব ছোট্ট জায়গা। তেলটা এখানে ছড়িয়ে পড়বার সুবিধা না পেয়ে নালার মত লম্বা ফাঁক দিয়ে সোজা লেজের দিকে বেরিয়ে যায়। সেই ধাক্কায় কাগজের মাছটা সামনের দিকে এগিয়ে চলে।

আজকাল তোমরা যে রকেট বা জেট-প্রোপেল্‌ড্ এরোপ্লেনের



কাগজের মাছ

কথা শুনতে পাও, সেগুলি ঠিক এমনি করেই গ্যাসের ধাক্কায় প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলে। উভয়েরই চলবার মূল রহস্য এক, পার্থক্য কেবল শক্তির তারতম্যে। আরও বড় হয়ে যখন এই বিষয়ে আলোচনা করবে, তখন একথা ভাল করে বুঝতে পারবে।

পল্‌তে-শূন্য বাতি

লোহা কঠিন পদার্থ হলেও উপযুক্ত উত্তাপ প্রয়োগে তরল হয়ে যায়। আবার তেল, জল প্রভৃতি তরল পদার্থ উত্তপ্ত হয়ে বায়বীয় অবস্থায় পরিণত হয়! কেরোসিন তেলে পল্‌তে ডুবিয়ে আমরা আলো জ্বালি, কিন্তু সেই তরল কেরোসিনকে উত্তাপ প্রয়োগে বায়বীয় অবস্থায় পরিবর্তিত করলে পল্‌তে ছাড়াই তাতে আলো জ্বালানো চলে। কেরোসিন স্টোভ জ্বলবার কারণই এই। পল্‌তের সাহায্যে মেথিলেটেড স্পিরিট দিয়ে বাতি জ্বালানো হয়। কিন্তু



পল্‌তে-শূন্য স্পিরিট বাতির নমুনা

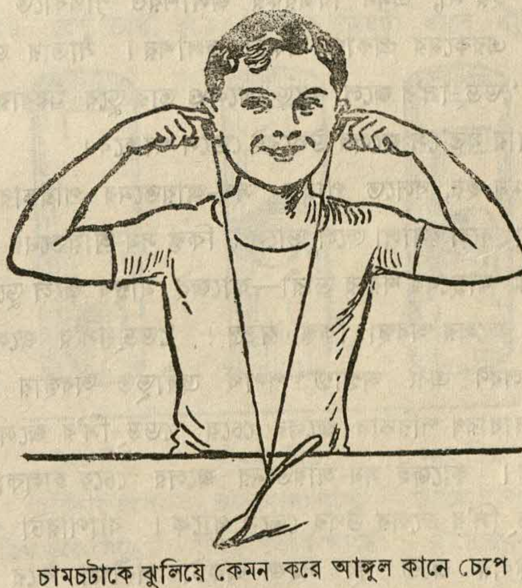
পল্‌তে ছাড়াও সহজেই মেথিলেটেড স্পিরিটের আলো জ্বালানো চলে। এটা তোমরা খুব সহজেই পরীক্ষা করে দেখতে পার। তবে খুব সাবধানে করবে, কারণ এতে খুব সহজেই আগুন ধরে যেতে পারে।

সাধারণ একটা টেস্ট টিউব সংগ্রহ কর। টেস্ট টিউবটার মুখে বেশ আঁট হয়ে বসতে পারে, এমন একটা কর্কের মধ্যে ছিদ্র করে

তাতে সরু একটা কাচের নল বসিয়ে দাও। কর্কের নীচে কাচের নলটার সামান্যই যেন বেরিয়ে থাকে। টেস্ট টিউবটার মধ্যে খানিকটা মেথিলেটেড স্পিরিট ভর্তি করে কাচের নলসমেত কর্কটা এঁটে বসিয়ে দাও। এই অবস্থায় টেস্ট টিউবটাকে ফুটন্ত গরম জলের মধ্যে বসিয়ে দিলেই কাচের নলের ভিতর দিয়ে গ্যাস বেরিয়ে আসতে সুরু করবে। এবার একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে দিলেই নলের মুখে বাতি জ্বলতে থাকবে।

চামচ থেকে শ্রুতিমধুর শব্দ

একখানা বড় চামচ সংগ্রহ কর। হাতলের মধ্যস্থলে সমান দৈর্ঘ্যের



চামচটাকে ঝুলিয়ে কেমন করে আঙ্গুল কানে চেপে ধরতে হবে, ছবিতে তাই দেখানো হয়েছে

লম্বা দু-গাছা সুতোয় গেরো বেঁধে চামচখানাকে ঝুলিয়ে দাও। সুতো

দু-গাছার অপর প্রান্তে দুটো ফাঁস তৈরি কর। ফাঁস দুটোর ভিতর দিয়ে দু-হাতের দুটো আঙ্গুল ঢুকিয়ে কানের ছিদ্রের উপর চেপে ধর। এবার চামচটাকে দুলিয়ে দুলিয়ে চেয়ার অথবা টেবিলের গায়ে ঠেকালেই সুমিষ্ট আওয়াজ শুনতে পাবে। কি রকম করে করতে হবে ছবি দেখলেই সহজে বুঝতে পারবে।

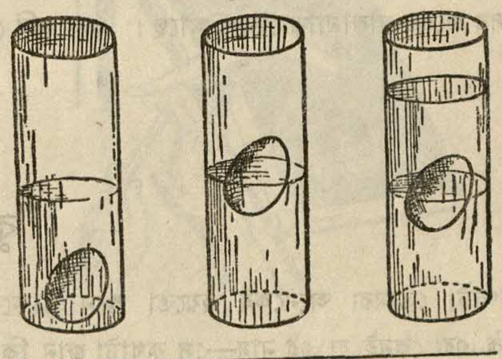
টাট্‌কা ডিম কি জলে ভাসে ?

ভূগোলে নিশ্চয়ই তোমরা 'ডেড্‌-সি'র কথা পড়েছ। 'ডেড্‌-সি' একটা প্রকাণ্ড হ্রদ। সাঁতার না জেনে জলে নামলে ডুবে মরতে হয় —একথা কাউকে বলে দিতে হবে না। কিন্তু সাঁতার না জেনেও জলে ডুবতে হয় না, এমন বিস্ময়কর জলাশয়ও পৃথিবীতে রয়েছে। 'ডেড্‌-সি'ই এরকমের প্রকাণ্ড একটা জলাশয়। সাঁতার জানে না, এমন কেউ 'ডেড্‌-সি'র জলে পড়ে গেলেও তার ডুবে মরবার আশঙ্কা নেই—সোলার মত সে জলের উপরেই ভেসে থাকবে।

কেন এমন হয়, বলতে পার ? সম-আয়তনের পরিষ্কার জলের চেয়ে হাল্‌কা বলে সোলা জলে ভাসে ; কিন্তু সম-আয়তনের পরিষ্কার জলের চেয়ে মানুষের শরীর ভারী—কাজেই মানুষ জলে ডুবে যায়। 'ডেড্‌-সি'র জলের অবস্থা কিন্তু স্বতন্ত্র ! 'ডেড্‌-সি'র জলে প্রচুর পরিমাণে লবণ এবং অন্যান্য পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় রয়েছে। সে জন্যে সাধারণ পরিষ্কার জলের চেয়ে 'ডেড্‌-সি'র জলের ঘনত্ব অনেক বেশী। কাজেই সম-আয়তনের জলের চেয়ে হাল্‌কা হওয়ায় মানুষ 'ডেড্‌-সি'র জলের উপর ভেসে থাকে। ব্যাপারটা পরিষ্কার ভাবে বোঝবার জন্যে খুব সহজ একটা পরীক্ষা করে দেখতে পার। দুটো কাচের গ্লাস নাও। একটা গ্লাসের অর্ধেকটা পরিষ্কার জলে ভর্তি কর। দ্বিতীয় গ্লাসটারও অর্ধেকটা অবধি পরিষ্কার জল

ভর্তি করে তাতে বেশ খানিকটা নুন ঢেলে দাও। নুন জলে গলে গেলে জলটা পরিষ্কারই দেখাবে। এবার একটা হাঁসের ডিম পরিষ্কার জলে ছেড়ে দাও। ডিমটা গ্লাসের তলায় ডুবে যাবে। কারণ টাট্‌কা ডিম তার সম-আয়তনের জলের চেয়ে ভারী। ১নং চিত্র দেখ। এবার ডিমটাকে গ্লাস থেকে তুলে এনে দ্বিতীয় গ্লাসের নুন-গোলা জলে ছেড়ে দাও। দেখবে, ডিমটা এবার গ্লাসের তলায় ডুবে না গিয়ে জলের উপর ভেসে থাকবে। ২নং চিত্র দেখ। এ থেকেই বুঝতে পারবে—'ডেড্‌-সি'র জলে মানুষ কেন ডুবে যায় না।

এবার ডিমটাকে তুলে এনে তার গায়ে এক জায়গায় খানিকটা নরম মোম এঁটে দিয়ে তার সঙ্গে কিছু সীসা বা লোহার কুচি জুড়ে দাও। সীসা বা লোহার কুচি লেগে থাকায় ডিমটা আগের চেয়ে কিছুটা ভারী হবে। ডিমটাকে এখন আবার নুন-গোলা জলের গ্লাসে ছেড়ে দাও। বেশী ভারী হয়ে থাকলে ডিমটা ধীরে ধীরে গ্লাসের



১নং চিত্র
পরিষ্কার জলে
ডিম ডুবে গেছে

২নং চিত্র
নুন গোলা জলে
ডিমটা ভেসে আছে

৩নং চিত্র
উপরে পরিষ্কার জল
নীচে নুন-গোলা জল

তলায় চলে যাবে। এক-আধটা কুচি তুলে নিলে খানিকটা হাল্কা হওয়ার দরুন ডিমটা আবার উপরের দিকে ভেসে উঠতে থাকবে।

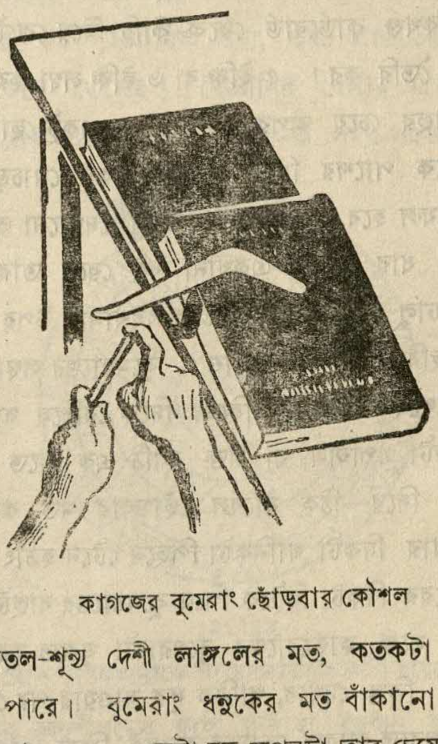
আচ্ছা, এবার চেষ্টা করে দেখ দেখি—ছু একটা কুচি খুলে নিয়ে অথবা এঁটে দিয়ে এমন ওজন করতে পার কিনা, যাতে ডিমটা জলের উপরে ভেসেও উঠবে না বা একেবারে ডুবেও যাবে না—জলের মাঝখানটায় ভেসে থাকবে ?

একটা সহজ উপায় বলে দিচ্ছি, যাতে অতি সহজেই ডিমটাকে জলের মাঝখানটায় ভাসিয়ে রাখতে পারবে। একটা ফানেল (বাংলায় যাকে ফুঁদেল বলা হয়) সংগ্রহ করে তার লম্বা চোঙটাতে ছোট্ট একটা রবারের নল পরিয়ে দাও। ফানেলটাকে পরিষ্কার জলের গ্লাসটার উপর ধরে রবারের নলটা গ্লাসের তলা অবধি চালিয়ে দাও। এবার দ্বিতীয় গ্লাসটার নুনগোলা জল ধীরে ধীরে ফানেলের মধ্যে ঢালতে থাক। নুন-গোলা জলটা গ্লাসের নীচের দিকেই থাকবে। পরিষ্কার জলটা উপরেই থেকে যাবে এবং গ্লাসের প্রায় কানা অবধি উঠবে। ডিমটাকে এবার এই গ্লাসের জলে ছেড়ে দাও। দেখবে, ডিমটা গ্লাসের জলের মাঝামাঝি ভেসে আছে। ৩নং ছবি দেখ।

বুমেরাং

বুমেরাং কথাটা তোমরা অনেকেই হয়তো শুনে থাকবে! কিন্তু বস্তুটা যে কি এবং কেনই বা এই নাম—সে কথাটা জান কি ? বুমেরাং অতি সাধারণ একটা বস্তু—সামান্য একখণ্ড কাঠ মাত্র। কাঠখানা সোজা নয়, একদিকে বাঁকানো এবং অনেকটা চ্যাপ্‌টা। এই বাঁকানো কাঠের কার্য-ক্ষমতা অদ্ভুত। অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা বহুকাল থেকে পাখী-শিকারের অস্ত্র হিসাবে এবং খেলাধূলার জন্যে বুমেরাং ব্যবহার করে আসছে। অবশ্য অস্ট্রেলিয়া ছাড়া অন্যান্য ছু-একটা দেশেও বুমেরাং ব্যবহারের কথা শোনা যায়। বুমেরাঙের মজা

হচ্ছে এই যে, কায়দা করে ছুঁড়ে মারতে পারলে, সেটা ঘুরতে ঘুরতে শূন্যপথে অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে আবার নিক্ষেপকারীর কাছেই ফিরে আসে। ফিরে আসবার কায়দাও বিভিন্ন রকমের হতে পারে। জিনিষটার গঠনে একটুখানি মোড় বা বাঁকের তারতম্য এবং ছোঁড়বার কৌশলের উপরই ফিরে আসবার রকমারি কায়দা নির্ভর করে। যুদ্ধের অস্ত্র হিসাবেও বুমেরাং ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেগুলি কিন্তু নিক্ষেপকারীর কাছে ফিরে আসে না। অনেকটা চ্যাপটা একখানা কাঠ দিয়ে বুমেরাং তৈরি করা হয়। এর চেহারা



কাগজের বুমেরাং ছোঁড়বার কৌশল

অনেকটা হাতল-শূন্য দেশী লাঙ্গলের মত, কতকটা ধনুকের মতও বলা যেতে পারে। বুমেরাং ধনুকের মত বাঁকানো হলেও ওর বাহু দুটো কিন্তু সমান নয়। একটা বড় অপরটা তার চেয়ে কিঞ্চিৎ ছোট

সাধারণ একখানা চ্যাপ্টা কাঠকে আকাশের দিকে ছুঁড়ে মারলে ঘুরতে ঘুরতে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে; কিন্তু সেটা আবার

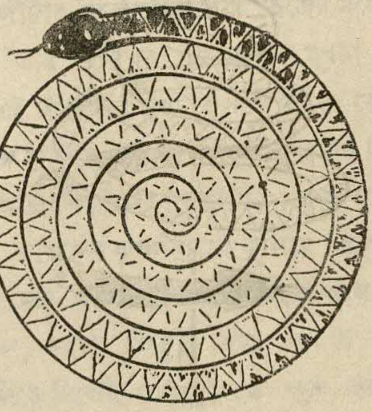
ঘুরতে ঘুরতে নিক্ষেপকারীর কাছে ফিরে আসে না। কিন্তু বুমেরাঙের বিশেষত্ব হলো, সেটা ঘুরতে ঘুরতে এগিয়ে গিয়ে লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করে ঘুরতে ঘুরতেই আবার নিক্ষেপকারীর কাছে ফিরে আসবে। কথাটা হয়তো তোমরা অতিশয়োক্তি বলে ভাবতে পার। কিন্তু অতিশয়োক্তি মোটেই নয়। ব্যাপারটা সত্যই এরূপ ঘটে কিনা নিজেরাই সেটা পরীক্ষা করে দেখতে পার। কিভাবে পরীক্ষা করবে বলে দিচ্ছি :—

ছবিতে টেবিলে রাখা বই দু'খানার উপর ধনুকের মত বাঁকানো একটা জিনিষ দেখতে পাচ্ছ। এটাই বুমেরাঙের নমুনা। পাত্‌লা অথচ শক্ত একখণ্ড কার্ডবোর্ড থেকে কাঁচি দিয়ে কেটে ওই রকমের একটা জিনিষ তৈরি কর। ৫ ইঞ্চি বা ৬ ইঞ্চি লম্বা করলেই চলবে। এর একটা বাহুর চেয়ে অপর বাহুটা যেন একটু ছোট হয়। বড় বাহুর লেজটাকে পাশের দিকে সামান্য একটু মোচড় দিয়ে দিলে অনেকটা ভাল ফল হবে। ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে তেমনি করে টেবিলের ধার ঘেঁষে একখানা বই রেখে তার উপর আর একখানা বই ঢালু ভাবে রাখ। ঢালু বইখানার উপর কার্ডবোর্ডের বুমেরাংটাকে ছবির মত করে বসাও। বুমেরাঙের লম্বা বাহুটা যেন টেবিলের ধার থেকে খানিকটা বাহিরের দিকে বেরিয়ে থাকে।

এবার একটা পেন্সিল বা শক্ত কাঠি এক হাতে ধর। অপর হাতের আঙ্গুল দিয়ে—ঠিক মার্বেল ছোঁড়বার মত করে কাঠি বা পেন্সিলের মাথার দিকটা খানিকটা পিছনে টেনে হঠাৎ ছেড়ে দাও। পেন্সিলের উপরের দিকটা ছিট্‌কে গিয়ে বুমেরাঙের বাহুটাকে আঘাত করবে। সঙ্গে সঙ্গে কার্ডবোর্ডের বুমেরাংটা ঘুরতে ঘুরতে শূন্যপথে এগিয়ে যাবে। কিন্তু দেখবে, খানিক দূর যাওয়ার পর সেটা মাটিতে না পড়ে ঘুরতে ঘুরতে আবার তোমার কাছেই ফিরে এসেছে। কেন এমন হয়—এস্থলে তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। বড় হয়ে পড়াশোনা করলেই বুঝতে পারবে।

ঘূর্ণায়মান সর্প

তোমরা অনেকেই হয়তো ছোটখাট অনেক রকম ম্যাজিক ও বিজ্ঞানের খেলা জান। ম্যাজিকের খেলা অনেকটা হাতের কৌশল বা চোখের ধাঁধা হলেও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি উন্মেষের সহায়ক। আর বৈজ্ঞানিক খেলা—যেগুলি তোমরা আমোদ উপভোগের জন্যে নেহাৎ খেলাচ্ছলেই শিখছ—বড় হয়ে যখন বিজ্ঞানের বিষয় পড়বে তখন দেখবে—তাতে কত বৈজ্ঞানিক তথ্য, কত প্রাকৃতিক রহস্য ছেলেবেলাতেই জেনে ফেলেছ! বৈজ্ঞানিক খেলার মধ্যে অনেকগুলি সহজসাধ্য হলেও প্রকৃত কারণটা অনেক সময় সহজবোধ্য হয় না।



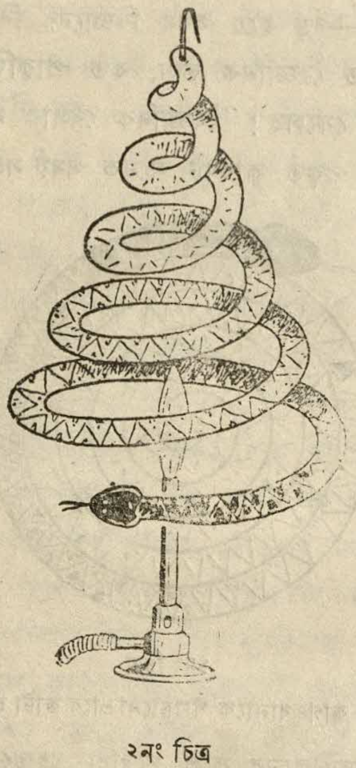
১নং চিত্র

গোল কাগজখানাকে প্যাঁচানোভাবে কাটা হয়েছে

কিন্তু বারংবার অনুশীলনের ফলে দুর্বোধ্য রহস্যও সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। কাজেই তোমাদের বিজ্ঞানানুরাগী করে গড়ে তোলবার জন্যে যেসব কৌতূহলোদ্দীপক খেলা বা পরীক্ষার কথা বলা হয়—আশা করি সেগুলি নিজের হাতে করে দেখবার চেষ্টা করবে। এখন

তোমাদের এরকমের একটা বৈজ্ঞানিক খেলার কথা বলে দিচ্ছি, যেটা খুব সহজেই করে দেখতে পার।

তোমরা সবাই জান গরম বাতাস উপরের দিকে উঠে যায়। কিন্তু গরম বাতাসের উর্ধ্বগতির প্রমাণ কি? ঠাণ্ডাই হোক আর গরমই হোক বাতাস তো আর চোখে দেখা যায় না! চোখে না দেখলেও বিভিন্ন রকমের পরীক্ষায় সেটা প্রমাণ করা যায়। তারই একটা পরীক্ষার কথা বলছি। ব্যাপারটা তেমন কিছুই নয়—খুবই সাধারণ তবে পরীক্ষাটা তোমাদের পক্ষে বেশ উপভোগ্য হবে বলেই মনে হয়.



২নং চিত্র
কাগজের কুণ্ডলীটাকে বার্ণারের উপর ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে

পোস্টকার্ডের মত পুরু একখানা বড় কাগজ যোগাড় কর। কম্পাস দিয়ে কাগজখানার উপর তিন ইঞ্চি ব্যাসার্ধের একটা বৃত্ত এঁকে

সেটাকে কাঁচি দিয়ে কেটে ফেল। ছয় ইঞ্চি ব্যাসের একখানা গোল কাগজের চাক্‌তি পাবে। কম্পাসের কাঁটাটা একটু চেপে বসিয়ে দিলেই কেন্দ্রস্থলের বিন্দুটা বেশ এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যাবে। এই ছিদ্রটা এমন হওয়া চাই যেন একটা আলপিন আলতোভাবে তার ভিতর দিয়ে গলে যেতে পারে; কিন্তু আলপিনের পিছনের দিকের বোতামের মত মাথাটা গলে যাবে না। এবার গোল কাগজখানাকে কাঁচি দিয়ে (বাঁকানো কাঁচি হলেই ভাল হয়) ভিতরের দিকে প্যাঁচানোভাবে কেটে দাও। ১নং ছবিতে যে রকম দেখানো হয়েছে, ঠিক সেভাবে কাটবে। এভাবে কাটবার পর গোল কাগজখানা একটা কুণ্ডলীতে পরিণত হবে। কাগজের কুণ্ডলীর উপর এবার সাপের গায়ের মত চাকা চাকা দাগ এঁকে দাও। জিনিষটাকে একটা সাপের মতই দেখাবে।

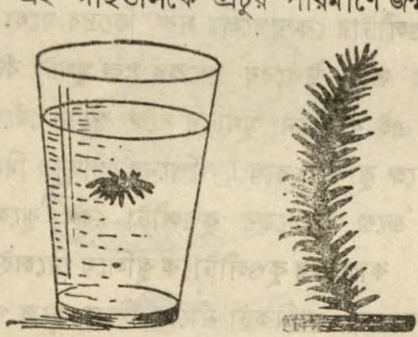
কাগজের কুণ্ডলীটার কেন্দ্রস্থলের সরু ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে একটা আলপিন গলিয়ে তার উপরের দিকের সরু মুখটা বঁড়শির মত করে বাঁকিয়ে দাও। এই বাঁকানো মুখটার সঙ্গে সুতো বেঁধে কুণ্ডলীটাকে উপরের কিছুর সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখ। পিনের গোড়ার দিকের বোতামের মত পদার্থটার জন্যে কাগজের কুণ্ডলীটা বেশ ঝুলে থাকবে এবং ঘুরতেও পারবে। কাগজের কুণ্ডলীটাকে ঝুলিয়ে দিলেই সেটা কুণ্ডলী-পাকানো সাপের মত খানিকটা নীচের দিকে ঝুলে পড়বে। এবার কুণ্ডলীটার মধ্যস্থল বরাবর কিছুটা নীচে একটা মোমবাতি অথবা গ্যাস বার্ণার জ্বালিয়ে দিলেই সেটা ঘুরতে সুরু করবে। ২নং ছবি ভাল করে দেখে নাও; ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবে।

কাগজের কুণ্ডলীটা ঘোরে কেন—বুঝতে পেরেছ তো?

বাতির শিখার চারদিকের বাতাস গরম হওয়ার ফলে উপরের দিকে উঠতে থাকে। সেই বায়ুপ্রবাহের ধাক্কায় কুণ্ডলীটা ঘুরতে থাকে। এটা গরম বাতাসের ঊর্ধ্বগতির প্রামাণ্য পরীক্ষা তো বটেই, আমোদজনক খেলাও নয় কি?

পাতার নাচন

এবার একটা জলজ উদ্ভিদের পরীক্ষার কথা বলব। পরীক্ষা খুবই সহজ, যদি একটু কষ্ট করে কোন পুকুর থেকে উদ্ভিদগুলি যোগাড় করতে পার। খাল, বিল, পুকুরের জলে এক রকমের লতানে গাছ জন্মে। তেঁতুল পাতা দেখতে যেমন হয় এই জলজ লতার পাতাগুলিও অনেকটা সেই রকমের। এক একটা সরু লম্বা ডাঁটার চারদিকে পাতাগুলি যেন স্তরে স্তরে সাজানো থাকে। এই লতানে গাছগুলি সাধারণতঃ জলঝাঁঝি নামে পরিচিত। ইংরেজীতে বলে—হাইড্রিলা। পাড়াগাঁয়ে তো অভাবই নেই, কলকাতার উপকণ্ঠে অনেক পুকুরে এই গাছগুলিকে প্রচুর পরিমাণে জন্মাতে দেখা যায়।



জলঝাঁঝির ছিন্ন পাতা গ্লাসের জলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে

একটা কাচের গ্লাসের অর্ধেকের বেশী জল ভর্তি কর। অল্প কয়েকটা পাতাসমেত জলঝাঁঝির কয়েকটা ডগা ছোট্ট করে কেটে নিয়ে সেগুলিকে গ্লাসের জলে ছেড়ে দাও। দেখবে—কয়েকটা জলের তলায় ডুবে যাবে, আবার কয়েকটা হয়তো ভেসে থাকবে। যেগুলি জলের তলায় ডুবে গেছে, তার মধ্য থেকে দু-একটা ভারী ডগা বেছে রেখে বাকিগুলি ফেলে দাও। গ্লাসটাকে এবার এমন একটা জায়গায় রাখ, যেখানে বেশ একটু আলো আছে। আমরা যে

সোডাওয়াটার ব্যবহার করি, সে রকমের এক বোতল সোডাওয়াটার নিয়ে এস। বোতলটা খুলে গ্লাসের জলে কয়েক ফোঁটা সোডাওয়াটার ঢেলে দাও। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলেই দেখবে, জলঝাঁঝির ডগাগুলি এবার নীচ থেকে ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠে আসছে। জলের উপরে এসেই কাটা দিক থেকে ছোট্ট এক ফোঁটা বুদ্‌বুদ্‌ ছেড়ে দিয়ে আবার আস্তে আস্তে গ্লাসের তলার দিকে নেমে যাবে। তারপর থেকে ডগাটা ক্রমাগতই এরূপ উপরে-নীচে ওঠা-নামা করতে থাকবে।

একটু ভারী ও সুবিধামত পাতা বাছাই করবার উপরই এই পরীক্ষার সাফল্য নির্ভর করে। পরীক্ষাটা একটু বুদ্ধি খাটিয়ে করতে হবে। যদি দেখ পাতাটা ঠিকমত ওঠা-নামা করছে না, তবে ডগা থেকে কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে গ্লাসের জলে ফেলবে। দেখবে —প্রত্যেকটা পাতাই ওভাবে ওঠা-নামা করছে। যদি তাতেও সুবিধা না হয় তবে আরও কয়েক ফোঁটা সোডাওয়াটার জলে ঢেলে দেবে। পরীক্ষাটা যদি ঠিকমত করতে পার, তবে নিজেই বুঝতে পারবে, কেন পাতাগুলি এভাবে ওঠা-নামা করে।

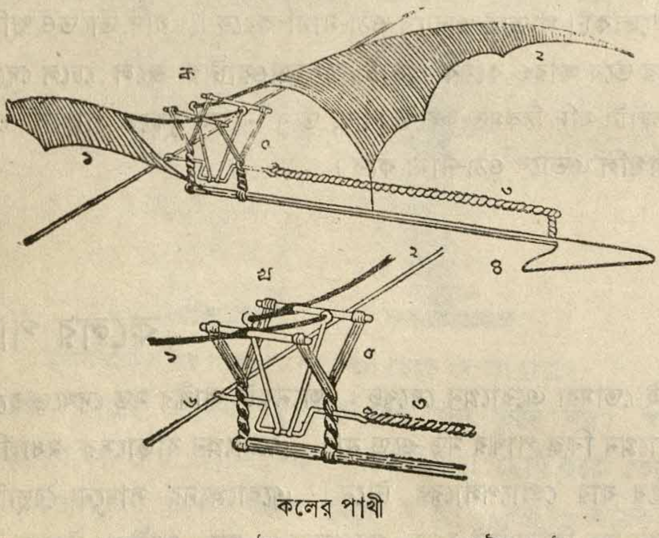
কলের পাখী

সবাই তোমরা এরোপ্লেন দেখেছ। অনেকটা পাখীর মত দেখতে হলেও এরোপ্লেন কিন্তু পাখীর মত ওড়ে না। এরোপ্লেন বাতাসের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায় প্রোপেলারের টানে। এরোপ্লেনের সামনে বৈদ্যুতিক পাখার মত জিনিষটাই হচ্ছে প্রপেলার। আর পাখীরা উপরে-নীচে ডানা আন্দোলন করে আকাশে উড়ে বেড়ায়। তোমরা অনেকেই হয়তো খেলনা এরোপ্লেন তৈরি করেছ; কিন্তু পাখীরা যেমন করে আকাশে ওড়ে, ঠিক তেমন কায়দায় কোন ওড়বার যন্ত্র তৈরি করে

দেখেছ কি ? ডানা নেড়ে ঠিক পাখীর মত আকাশে উড়ে বেড়াতে পারে এরকমের খুব সহজ একটা যন্ত্র তৈরি করবার কৌশল বলে দিচ্ছি। ছবিটা দেখে অনায়াসে এই রকমের একটা কলের পাখী তৈরি করতে পারবে।

ছবিটাকে ভাল করে দেখে নাও। উপরের 'ক' চিহ্নিত ছবিটাতে কলের পাখীর পুরোপুরি নমুনা দেওয়া হয়েছে। কি কৌশলে 'ক' চিহ্নিত পাখীটা ডানা কাঁপিয়ে বাতাসে উড়বে, 'খ' চিহ্নিত চিত্রে সেটা একটু বড় করে পরিষ্কারভাবে দেখানো হয়েছে। একটু ভাল করে লক্ষ্য করলে ছবি থেকেই কৌশলটা বুঝতে পারবে।

প্রথমে খানিকটা লম্বা—ধর, প্রায় দেড় ফুট লম্বা একটা মোটা তার সোজা করে নাও। এই লম্বা তারটার একদিকে ইংরেজী Y অক্ষরের মত ছুটো খুঁটি বসাতে হবে। (ছবির ৫নং দেখ)। ১নং এবং



কলের পাখী

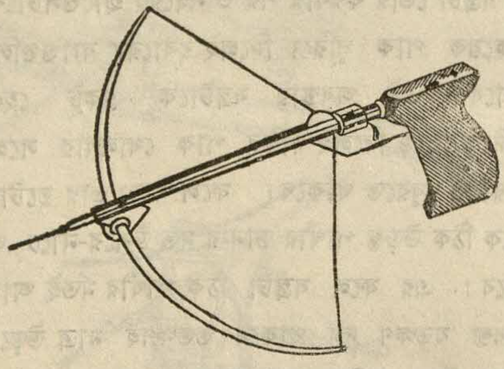
২ নম্বরের ডানার ফ্রেম ছুটোকে ৫ নম্বরের খুঁটির ছুটো বাহুর সঙ্গে সমান্তরালে বসানো ছু-খণ্ড সোজা তারের উপর এমনভাবে বসিয়ে দাও যাতে ডানা ছুটো অতি সহজেই উঁচু-নীচু ওঠা-নামা করতে পারে। ৫ নম্বরের খুঁটি ছুটোর একটু নীচের দিকের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে

৬ নম্বরের মত উভয়দিকে সমকোণে বাঁকানো একটা তার গলিয়ে দাও। এই তারটার সামনের দিকে আর একটা শক্ত তার সমকোণে হাতলের মত জুড়ে দিতে হবে। ছিদ্রের মধ্য দিয়ে গলানো ওই তারটার পিছনের দিকটা হুকের মত বাঁকিয়ে দিতে হবে। এই হুকটার সঙ্গে সংলগ্ন দু-গাছা বা চারগাছা সরু রবারের ব্যাণ্ড ফ্রেমের শেষ প্রান্তে আর একটা শক্ত হুকের সঙ্গে আট্‌কানো থাকবে (চিত্রের ৩নং দেখ)। ১নং ও ২নং ডানার ফ্রেমের গোড়ার দিকের দু-প্রান্ত, ৬নং তারের মধ্যকার ভাঁজের সঙ্গে দু-দিক আংটির মত বাঁকানো ছোট্ট দুটি সোজা তার দিয়ে ছবির মত করে পরিয়ে দেবে। ডানার কাঠামোটাকে এবার সেলোফেন বা কলোডিয়ন বেলুনের পাত্‌লা পর্দা দিয়ে মুড়ে দাও। সোলোফেন-মোড়া ডানা দুটোর চওড়া দিকের মুক্ত প্রান্ত সুতো দিয়ে ফ্রেমের সঙ্গে বাঁধা থাকবে। ফ্রেমটার শেষের দিকে থাকবে ৪ নম্বরের মত পাত্‌লা লেজ।

এভাবে যন্ত্রটা তৈরি করবার পর ৬ নম্বরের হ্যাণ্ডেলটাকে যে কোন একদিকে কয়েক পাক ঘুরিয়ে দিলেই রবারের ব্যাণ্ডগুলি দড়ির মত পাকিয়ে যাবে। এই অবস্থায় যন্ত্রটাকে একটু হেলানোভাবে আকাশের দিকে ছেড়ে দিলেই দড়ির পাক খোলবার সঙ্গে সঙ্গে ৬ নম্বরের তারটাও ঘুরতে থাকবে। ফলে খাড়া তার দুটোর সাহায্যে ডানা দুটোকে ঠিক উড়ন্ত পাখীর ডানার মত উপরে-নীচে আন্দোলিত করতে থাকবে। এর ফলে যন্ত্রটা ঠিক পাখীর মতই আকাশে উড়ে যাবে। অবশ্য যতক্ষণ দম থাকবে ততক্ষণই মাত্র উড়তে পারবে। ভারী জিনিষ নিয়ে বেশীক্ষণ দম রাখবার উপযুক্ত হাল্কা মোটর ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করতে পারলে তোমরাও এভাবে অনায়াসে পাখীর মত আকাশে উড়ে বেড়াতে পার।

পিস্তল ধনুক

ছবিটা দেখলেই বুঝতে পারবে—ব্যাপারটা কি? সাধারণ ধনুককে পিস্তল বা বন্দুকের মত ব্যবহার করবার জন্যেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ধনুক ঠিক পিস্তলের মত এক হাতে বা বন্দুকের মত দু-হাতেও ছোঁড়া যায়। এর পাল্লাও বড় কম নয়—ছোট, বড় সব রকম শিকারকে অব্যর্থ লক্ষ্যে ঘায়েল করা যায়। এর নির্মাণ-কৌশল সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন; ছবি থেকেই সহজে বোঝা যাবে। ধনুকটা যত বড় হবে তদনুযায়ী একখানা সরু লম্বা কাঠের উপরদিকে, বরাবর লম্বা খাঁজ কেটে নাও। ধনুকটা কাঠখানার সম্মুখভাগে শক্তভাবে আঁটা থাকবে। কাঠখানার পিছনে ধরবার স্থবিধার জন্যে পিস্তলের মত বাঁট তৈরি করা দরকার। এই বাঁটের কাছে, উপর-নীচে এফোঁড়-ওফোঁড় করে একটা ছিদ্র



পিস্তল-ধনুক

কর। ছিদ্রটা এমন হবে যেন মোটা পেরেকের মত একখণ্ড লোহার তার আল্‌তোভাবে তার মধ্যে ঢুকে যেতে পারে। লোহার তারের বদলে ছবির মত পাতলা একখণ্ড লোহার পাতও বসাতে পার। ছোট্ট একটা স্প্রিঙের সাহায্যে এই তার বা পাতটা কাঠের ছিদ্রের মধ্যে

এমনভাবে বসানো থাকবে যে, উপর থেকে টিপলেই নীচে নেমে যায়, আবার ছেড়ে দিলেই খানিকটা উপরে উঠে আসে। এই লোহার তারটার উপরের দিকটা থাকবে, ইংরেজী U অক্ষরের মত চেরা। কাঠখানার নীচের দিকে বাঁটের কাছে, পিস্তলের ট্রিগার বা ঘোড়ার মত একটা চাবি বসাও। ছিদ্রের মধ্য দিয়ে গলানো তারটার নীচের প্রান্তভাগ চাবির সঙ্গে কব্জার মত করে এমনভাবে সংলগ্ন থাকবে যে, চাবিটাকে পিছন দিকে একটু টানলেই তারটা ছিদ্রের খানিকটা নীচে চলে আসে; আবার ছেড়ে দিলেই উপরে উঠে যায়।

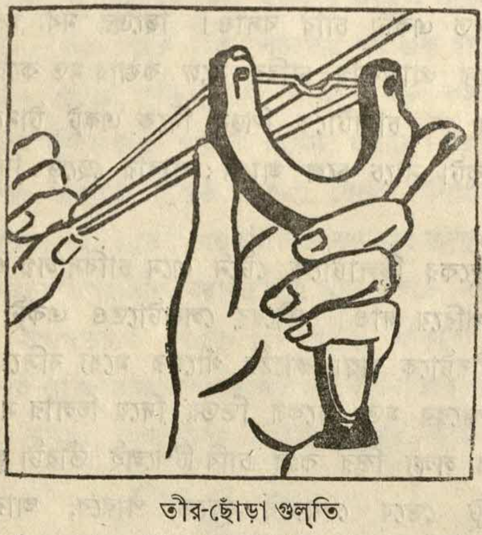
এবার ধনুকের ছিলাটাকে টেনে এনে চাবিসংলগ্ন ওই তারটার পিছনদিকে পরিয়ে দাও। তীরের লেজটাতেও একটু খাঁজকাটা থাকবে। তীরটাকে লম্বা কাঠের খাঁজের মধ্যে বসিয়ে লেজটাকে তারের U অক্ষরের মত ফাঁকের ভিতর দিয়ে ছিলার সঙ্গে লাগিয়ে দাও। এবার লক্ষ্য স্থির করে চাবি টিপলেই তীরটা ছুটে বেরিয়ে যাবে। একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে, আরও অন্যান্য কৌশলেও এরকমের ধনুক তৈরি করা যায়।

তীর-ছোঁড়ার গুল্‌তি

এবার তোমাদিগকে খুব সাধারণ একটা জিনিস তৈরির কথা বলছি। জিনিসটা তোমাদের সবাই-এর কাছেই পরিচিত এবং অনেকে হয়তো করেই দেখেছ! যারা করে দেখো নি, এবার তারা করে দেখো।

পাখি-মারা গুল্‌তি তোমরা অনেকেই ব্যবহার করে থাকবে! লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করবার জন্যে তোমরা গুল্‌তিতে ইট বা পাথরের

কুচি অথবা ছোট ছোট পোড়ামাটির ডেলা ব্যবহার করে থাক। গুলতির সাহায্যে ডেলাগুলিকে খুব জোরে ছুঁড়ে মারা যায় সত্য, কিন্তু লক্ষ্যভেদ করা সহজ নয়! লক্ষ্যভেদ করতে হলে গুল্‌তি ছোঁড়বার বিশেষ নৈপুণ্য এবং অভ্যাসের প্রয়োজন। কিন্তু মাটির ডেলা



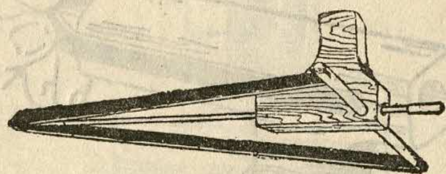
তীর-ছোঁড়া গুল্‌তি

বা পাথরের টুকরোর পরিবর্তে যদি তীর ব্যবহার কর তবে দেখবে, লক্ষ্যভেদ করা কত সহজ হয়ে দাঁড়ায়। তোমরা সাধারণত যে রকমের খেলনা গুল্‌তি ব্যবহার কর, তীর ছুঁড়তে হলে তার কাঠের ফ্রেমটা আর একটু বড় করে নিলে সুবিধা হয়। রবারের ফিতেটাকেও তদনুযায়ী বড় করে নেওয়া ভাল। অবশ্য সাধারণ গুল্‌তিতেও তীর ছোঁড়া চল্‌তে পারে। তবে তীর ছুঁড়তে হলে একটু নতুন ব্যবস্থা করতে হবে। সে কথা বলছি।

এক গাছা সরু তারের মাঝখানটা অর্ধবৃত্তাকারে বাঁকিয়ে নাও। ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনিভাবে সেই বাঁকানো তারটাকে গুল্‌তির ফ্রেমের বাহু দুটোর প্রান্তভাগে আট্‌কে দাও। এবার তারের ওই বাঁকানো জায়গাটার উপর তীরটাকে রেখে লক্ষ্য স্থির করে রবারের ফিতে টেনে ছেড়ে দাও—দেখবে কত সহজে লক্ষ্যভেদ

করতে পারা যায়। গুল্‌তিটাকে যদি কোন ভারী ফ্রেম বা স্ট্যাণ্ডের উপর দৃঢ়ভাবে বসিয়ে ব্যবহার করতে পার, তবে লক্ষ্যভেদ করা আরও সহজ হবে।

এবার আর একরকমের তীর-ছোঁড়া গুল্‌তির কথা বলছি। জিনিসটা কি রকম হবে, ছবিটা দেখলেই বুঝতে পারবে। ৫।৬ ইঞ্চি লম্বা একখানা চৌকো কাঠের মধ্যে লম্বালম্বি ছিদ্র কর। ঐ ছিদ্রের উপরে পাশাপাশিভাবে কাঠখানার মধ্যে একটু মোটা ছিদ্র করে ৫।৬ ইঞ্চি লম্বা, পেন্সিলের চেয়ে মোটা এক টুক্‌রো শক্ত কাঠের রড বেশ এঁটে ঢুকিয়ে দাও।



তীর-ছোঁড়া গুল্‌তি

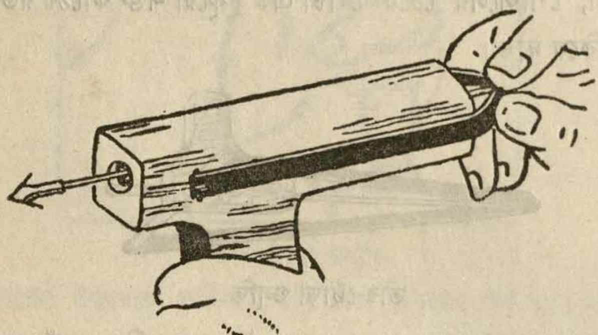
এই রডের দু-প্রান্তে রবারের একটা লম্বা ফিতা বেঁধে দাও। চৌকো কাঠখানার নীচের দিকে ধরবার জন্যে একটা হাতল লাগাতে হবে। এবার ফলাশূন্য তীর লম্বালম্বি ছিদ্রটার ভিতর দিয়ে পরিয়ে ফিতে টেনে ছেড়ে দিলেই তীরটা ঠিক সোজাসুজি ছুটে যাবে।

তীর ছোঁড়া বন্দুক

তোমাদের কয়েক রকম তীরছোঁড়া গুল্‌তি তৈরির কথা বলছি। এবার এর চেয়ে আরও জোরালো অন্য আর এক রকম লক্ষ্যভেদী তীর ছোঁড়বার ব্যবস্থার কথা বলছি।

এটাও গুল্‌তির মতই একটা ব্যাপার, তবে রকমফের মাত্র।

হাতদেড়েক লম্বা একখানা চৌকো কাঠ সংগ্রহ কর। কাঠখানাকে লম্বালম্বিভাবে সমান দু-ভাগে চিরে ফেল। অর্ধ গোলাকার বাটালি দিয়ে দু-খানা কাঠেরই ভিতর দিকে লম্বালম্বিভাবে নালি কেটে দাও। এবার নালি-কাটা কাঠ দু-খানাকে পূর্বের মত একত্র করে স্ক্রু দিয়ে এঁটে দিলেই দেখবে—বেশ সোজা একটি নল হয়ে গেছে। বেশ শক্ত এবং পুরু একটা রবারের ব্যাণ্ড যোগাড় করতে হবে। মোটরের পুরনো টিউব থেকে ফিতের মত করে কেটে নিলেও চলে। পেরেক

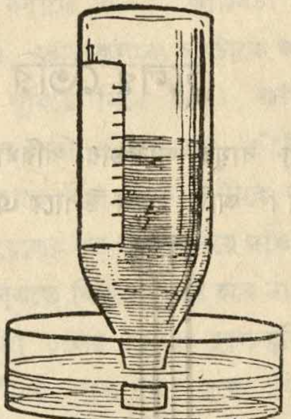


তীর-ছোঁড়া বন্দুক

দিয়েই হোক, কি অন্য যে কোন রকমেই হোক, কাঠের নলটার সামনের মুখের প্রায় কাছাকাছি ফিতের দু-প্রান্ত দু-দিকে এঁটে দাও। ফিতেটা কাঠের নলের পিছনের দিক দিয়ে ঘুরে যাবে। ছবিটা দেখে নাও, সহজেই বুঝতে পারবে। ধরবার জন্যে বন্দুকের হাতলের মত কাঠখানার সামনের দিকে স্ক্রু এঁটে একটা হাতল বসিয়ে নিতে হবে। এটা হলো কাঠের বন্দুক। এবার নলের সামনের দিক দিয়ে একটা তীর ঢুকিয়ে রবারের ব্যাণ্ডকে টেনে ছেড়ে দিলেই দেখবে—তীরটা কত জোরে সোজা ছুটে চলে!

বোতল ব্যারোমিটার

বায়ুমণ্ডলের চাপের পরিবর্তনের ফলে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে থাকে। যে যন্ত্রের দ্বারা বায়ুমণ্ডলের চাপ নির্ধারণ করা যায়, তাকে বলে ব্যারোমিটার বা বায়ুমান যন্ত্র। তোমরা অনেকেই



বোতল-ব্যারোমিটার

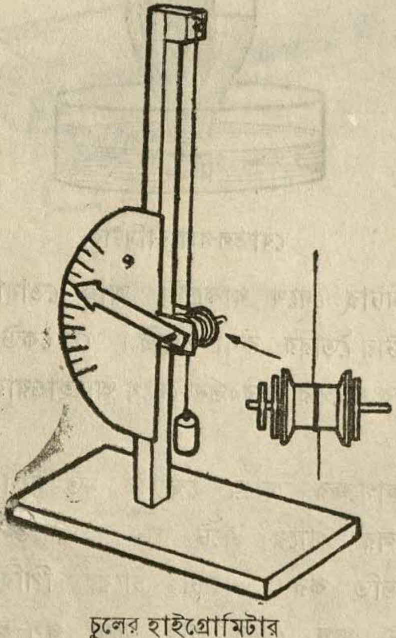
হয়তো ব্যারোমিটার দেখে থাকবে! আজ তোমাদের সহজ এক রকম ব্যারোমিটার তৈরির কথা বলছি। যে কেউ এই যন্ত্র তৈরি করে বায়ুমণ্ডলের চাপের পরিবর্তন দেখে আবহাওয়ার পরিবর্তন বুঝতে পারবে।

একখণ্ড কাগজের গায়ে স্কেলের মত দাগ কেটে সেটাকে একটা বোতলের গায়ে এঁটে দাও। বোতলটাকে অর্ধেকের বেশী জলে ভর্তি কর। একটা চায়ের পিরিচ বা কানা-উঁচু পাত্রে খানিকটা জল রেখে তার মধ্যে জল-ভর্তি বোতলটাকে উল্টো করে বসিয়ে দাও। এটাই হবে ব্যারোমিটার। বোতলের গায়ের স্কেলের সাহায্যে দেখতে পাবে, আবহাওয়ার পরিবর্তনের

সঙ্গে সঙ্গে বোতলের জলের লেভেলও উঁচু-নীচু হবে। আবহাওয়ার সঙ্গে একবার মিলিয়ে দেখে নিলেই পরে জলের লেভেলের পরিবর্তন দেখে আবহাওয়ার আসন্ন দুর্যোগের কথা বুঝতে পারবে। বোতল ব্যারোমিটার তৈরির ব্যবস্থাটা সহজেই বুঝতে পারবে ছবি থেকে।

চুলের তৈরি হাইগ্রোমিটার

যে যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুর আর্দ্রতার পরিমাপ করা যায়, তাকে বলে হাইগ্রোমিটার। অতি সহজ উপায়ে এক রকম হাইগ্রোমিটার



চুলের হাইগ্রোমিটার

তৈরি করবার কৌশল বলে দিচ্ছি। চেষ্টা করে দেখো—অনায়াসেই এরকমের হাইগ্রোমিটার তৈরি করতে পারবে। প্রায় এক ফুট

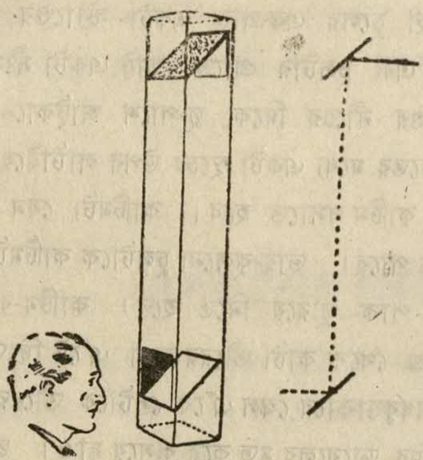
লম্বা কয়েকগাছা চুল সংগ্রহ কর। জলমিশ্রিত কষ্টিক সোডা (হাল্কা সলিউসন) দিয়ে চুলের তৈলাক্ত পদার্থ বেশ করে পরিষ্কার করে নাও। এবার একগাছা চুলের একপ্রান্ত একটা স্ট্যাণ্ডের উপরের দিকে আট্‌কে দাও এবং চুলটার প্রান্তে ছোট্ট একটা সীসার বল ঝুলিয়ে দাও। স্ট্যাণ্ডের নীচের দিকে, ছ-পাশে আট্‌কানো দুখানা ছিদ্র করা টিনের পাতের মধ্যে একটা সূচের উপর লাটাইয়ের মত করে খুব হাল্কা একটা কাটিম বসাতে হবে। কাটিমটা যেন খুব সহজভাবে দুদিকেই ঘুরতে পারে। ভার-ঝুলনো চুলটাকে কাটিমটার উপর দিয়ে এক কি দুই পাক ঘুরিয়ে নিতে হবে। কাটিম-বসানো সূচটার একদিকে কাগজ থেকে কাটা তীরের ফলা এঁটে দিতে হবে। সাদা পোস্টকার্ডে অর্ধবৃত্তাকারে স্কেল এঁকে সেটাকে তীরের ফলাটার প্রায় গা ঘেঁষে ঘড়ির ডায়েলের মত করে বসিয়ে দাও। ছবিটা ভাল করে দেখে নাও, ব্যবস্থাটা বুঝতে কিছুমাত্র কষ্ট হবে না। বায়ুমণ্ডলের কম-বেশী আর্দ্রতা অনুযায়ী চুলের দৈর্ঘ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে। এর ফলে কাটিমটার সঙ্গে তীরের ফলাটাও ঘুরে গিয়ে ডায়েলের উপর আবহাওয়ার অবস্থার নির্দেশ দেবে।

পেরিস্কোপ

তোমরা খেলার মাঠে বা বড় বড় সভা-সমিতিতে নিজের হাতে তৈরি পেরিস্কোপ ব্যবহার করতে দেখেছ। দৃষ্টিপথে কোন বাধা-বিঘ্ন থাকলে পেরিস্কোপের সাহায্যে সে বাধা অতিক্রম করতে পারা যায়। বিভিন্ন রকমের পেরিস্কোপ তৈরি হতে পারে এবং তৈরি করাও খুব সহজ। তোমরা যাতে নিজের হাতে তৈরি করতে পার, সে জন্যে দু-রকমের পেরিস্কোপ তৈরির উপায় বলে দিচ্ছি।

কার্ডবোর্ড, টিন, কাঠ বা অন্য কিছু দিয়ে একটা লম্বা চতুষ্কোণ

বাক্সের মত তৈরি কর। এই লম্বা বাক্সটার দু-প্রান্তে পাশের দিকে বিপরীতভাবে দুটো চতুষ্কোণ গর্ত করতে হবে। উপরের প্রান্তে

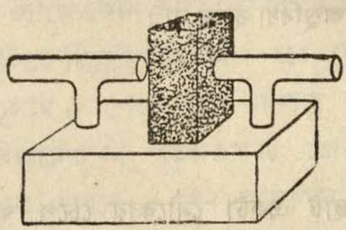


১নং চিত্র

পেরিস্কোপে আয়না বসাবার ব্যবস্থা

একখানা চৌকো আয়না ৪৫ ডিগ্রিতে হেলানোভাবে বসাও। এই আয়নার কাচটা থাকবে পাশের গর্ত বরাবর নীচের দিকে মুখ করে। নীচের গর্তের কাছেও পূর্বের আয়নার মত ৪৫ ডিগ্রি হেলানোভাবে আর একখানা আয়না বসাও। এই আয়নার কাচটা থাকবে উপরের দিকে মুখ করে। উপর ও নীচের দুটো আয়নাই এমনভাবে হেলিয়ে বসাবে যেন তারা পরস্পর সমান্তরালে থাকে। এবার লম্বা বাক্সটার উপরের মুখ উঁচু করে ধরে নীচের কাচখানার দিকে তাকালেই যে কোন প্রতিবন্ধক অতিক্রম করে দূরের দৃশ্য দেখতে পাবে। ১ নম্বরের ছবিখানা ভাল করে দেখে যন্ত্র তৈরি করতে চেষ্টা কর। এছাড়া একটা লম্বা লাঠির দুপ্রান্তে ৪৫ ডিগ্রি কোণ করে দুখানা আয়না বসিয়ে দিলেও ঠিক ওই রকমের কাজ হবে। উপরের কাচখানাকে সুতো বেঁধে ইচ্ছামত ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বিভিন্ন দৃশ্য দেখবার ব্যবস্থাও করতে পারি।

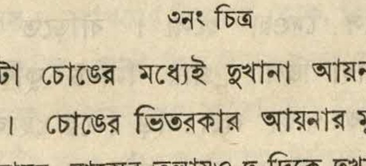
আর একরকম পেরিস্কোপ তৈরি করতে পার—যা একটু জটিল হলেও তৈরি করতে তেমন কোন গুরুতর অসুবিধা নেই। ২নম্বরের ছবি দেখ। যন্ত্রটা হবে এই ছবির মত। শক্ত কার্ডবোর্ডের চওড়া



২নং চিত্র

শয়ানভাবে তৈরি পেরিস্কোপ

একটা বাক্স যোগাড় কর। ইংরেজী T অক্ষরের মত কাগজের দুটি চোঙ তৈরি করতে হবে। T-এর আকৃতিবিশিষ্ট এই চোঙ দুটিকে বাক্সটার উপরে ছিদ্র করে এঁটে বসিয়ে দাও। এবার ৩ নম্বরের



৩নং চিত্র

ছবি দেখ। দুটো চোঙের মধ্যেই দুখানা আয়না ৪৫ ডিগ্রি কোণ করে বসাতে হবে। চোঙের ভিতরকার আয়নার মুখ থাকবে নীচের দিকে। চোঙ বরাবর বাক্সের তলায়ও দু-দিকে দুখানা আয়না থাকবে হেলানোভাবে, উপরের আয়নার সমান্তরালে। নীচের আয়না দুখানার মুখ থাকবে উপরের দিকে।

যে কোন একদিকের চোঙের মধ্য দিয়ে তোমার বন্ধুদের কোন একটা জিনিস দেখতে বল। বেশ দেখা যাবে। এবার একখানা ইট, কাঠ বা মোটা বই চোঙ দুটোর মধ্যস্থলে ২নং ছবির মত করে দাঁড় করিয়ে দাও। বন্ধুরা নিশ্চয়ই ভাববে—এবার আর চোঙের

মধ্যে দিয়ে পূর্বের সেই দূরের জিনিসটাকে দেখা যাবে না। কিন্তু চোঙের মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে তারা অবাক হয়ে যাবে—দূরের জিনিসটা আগের মতই দেখা যাচ্ছে। ইট, কাঠ বা বই মধ্যস্থলে রাখাতেও দেখবার অসুবিধা হচ্ছে না।

চুম্বক বড়শী

কয়েকটি ছেলে ছোট একটা নৌকোয় চেপে খালের জলে বাইচ খেলছিল। অসতর্কতার ফলে একটি ছেলের হাত থেকে দামী একখানা রজার্সের ছুরি জলে পড়ে যায়। ছুরিটা উদ্ধার করবার জন্যে এক একজন এক এক রকম মতলবের কথা বলছিল। এদিকে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে আসছে। জলে কেউ নামতে রাজী নয়। তাছাড়া জলে নেমে যে ছুরিটা উদ্ধার করা সম্ভব নয়, সে বিষয়ে কারো কোন সন্দেহ ছিল না। কারণ খোঁজাখুঁজিতে ছুরিটার পাঁকের তলায় চলে যাবার সম্ভাবনাই বেশী। একটি ছেলে এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। সে বললো, আমি নৌকোয় বসেই ছুরিটা তোলবার ব্যবস্থা করছি, আমাকে পাড়ে তুলে দাও। বাড়ি তার ওখান থেকে খুব কাছেই। তাকে পাড়ে তুলে দেওয়া হলো। বাড়িতে ছেলেটির একটা পুরনো চুম্বক লোহা ছিল। প্রায় মিনিট কুড়ির মধ্যেই চুম্বক লোহাটা আর এক গাছা লম্বা দড়ি নিয়ে ছেলেটি ফিরে এল। চুম্বকটাকে দড়ির এক প্রান্তে বেঁধে নৌকোয় বসেই সেটাকে জলে নামিয়ে দিল। ছুরিটা যেখানে পড়েছিল, দড়ি-বাঁধা চুম্বকটাকে সেখানে কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক নাড়াচাড়া করবার পরই ছুরিটা চুম্বকের গায়ে লেগে উঠে এল।

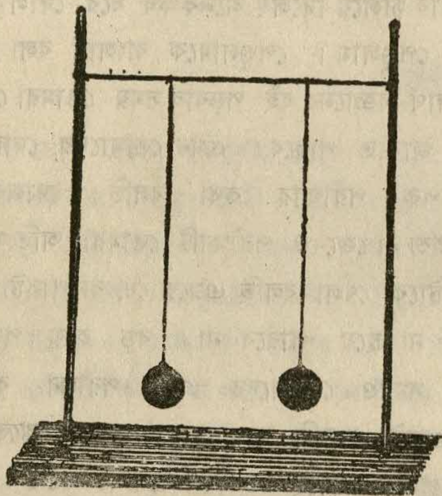
তোমাদের অনেকেরই এরকম বুদ্ধি খেলে নিশ্চয়! অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধিৎসার ফলে এই বুদ্ধিই ক্রমশ বাড়তে বাড়তে বৈজ্ঞানিক প্রতিভার স্ফুরণ করে থাকে।

পেণ্ডুলামের খেলা

দেয়াল-ঘড়ির পেণ্ডুলাম তোমরা সবাই দেখেছ। সরু তারের সঙ্গে ঝুলনো একটা ভারী জিনিস সমান তালে এদিক-ওদিক দোল খাচ্ছে। লম্বা সুতোর এক প্রান্তে কোন ভারী জিনিস বেঁধে উঁচু জায়গা থেকে ঝুলিয়ে একবার দুলিয়ে দিলেই অনেকক্ষণ ধরে দোল খেতে থাকে। এটাই হলো পেণ্ডুলাম। পেণ্ডুলামকে বাংলায় বলা হয় দোলক। বড় হয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানের বই পড়বার সময় তোমরা দোলক সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারবে। এখন তোমাদের দোলকের একটা কৌতূহলোদ্দীপক পরীক্ষার কথা বলছি। দোলক সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক রহস্য না জেনেও পরীক্ষাটি তোমরা অতি সহজেই করতে পারবে। এটাকে খেলা বলছি এজন্যে যে, ব্যাপারটা দেখে তোমরা বেশ অবাক না হয়ে পারবে না। বড় হয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানের আলোচনার সময়ও তোমাদের এসব পরীক্ষা করতে হবে। খেলাচ্ছলে এখনই সেগুলি করে দেখলে, পরে বুঝতে পারবে দুরূহ রহস্যগুলিও তোমাদের কাছে কত সহজ বলে মনে হচ্ছে।

পেণ্ডুলামের খেলার ব্যাপারটা তেমন কিছুই নয়। পরীক্ষার জন্যে দরকার হবে মাত্র—খানিকটা সুতো আর দু-টুক্‌রো পাথর বা অন্য কোন ভারী জিনিস। পাথরের টুক্‌রোই হোক, কি অন্য কোন ভারী জিনিসই হোক—দুটোর ওজনই কিন্তু সমান হওয়া দরকার। পাথরের টুক্‌রো দুটোর সঙ্গে দু-গাছা লম্বা সুতো বেঁধে নিতে হবে। তারপর দু-দিকে দুটো খুঁটির সঙ্গে একগাছা সুতো টাঙিয়ে দাও। সুতোটা বেশ টান করে বাঁধবে। এখন খুঁটির সঙ্গে টাঙানো সুতো থেকে সুতোয় বাঁধা পাথরের টুক্‌রো দুটো ঝুলিয়ে দিতে হবে। ঝুলনো পাথরের টুক্‌রো দুটো যেন পরস্পর থেকে বেশ কিছুটা তফাতে থাকে এবং সুতো দুটোও সমান হওয়া দরকার। এই হলো পরীক্ষার যাবতীয় সরঞ্জাম। মোটের উপর ব্যাপারটা হবে—আড়াআড়িভাবে টাঙানো সুতোর সঙ্গে ঝোলানো দুটো দোলক।

পাথরের টুক্‌রো দুটো যখন স্থিরভাবে থাকবে, তখন যে কোন একটা দোলককে হাত দিয়ে সামনে পিছনে একটু দুলিয়ে দাও। দোলকটা ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দুলতে থাকবে। কিছুক্ষণ বাদেই দেখবে—দ্বিতীয় দোলকটাও (যেটা একেবারে স্থির ছিল) একটু



আড়াআড়িভাবে টাঙানো সুতোর সঙ্গে
দুটি পেণ্ডুলাম ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে

একটু করে দুলতে সুরু করেছে। আরও কিছুক্ষণ লক্ষ্য কর। দেখবে—দ্বিতীয় দোলকটার দোলন ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে; কিন্তু প্রথমটার দোলন ক্রমশ কমে আসছে। আরও কিছুক্ষণ পরে দেখবে—প্রথমটার দোলন প্রায় থেমে আসছে, কিন্তু দ্বিতীয়টার দোলন ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে! এরপর আবার প্রথমটার দোলন পূর্বের মতই বেড়ে যাবে। এমনিভাবে দোলক দুটো পর্যায়ক্রমে পরপর একবার আস্তে আবার জোরে দুলতে থাকবে। মাঝে মাঝে এমনও দেখা যাবে যে, দুটো দোলকই প্রায় সমানভাবে দুলছে। অনেকক্ষণ এভাবে দুলতে দুলতে অবশ্য দুটো দোলকই এক সময়ে স্থির হয়ে যাবে।

দোলক দুটো কেন এমন অদ্ভুত ব্যবহার করে, বার বার পরীক্ষার ফলে সহজেই সে কথাটা বুঝতে পারবে।

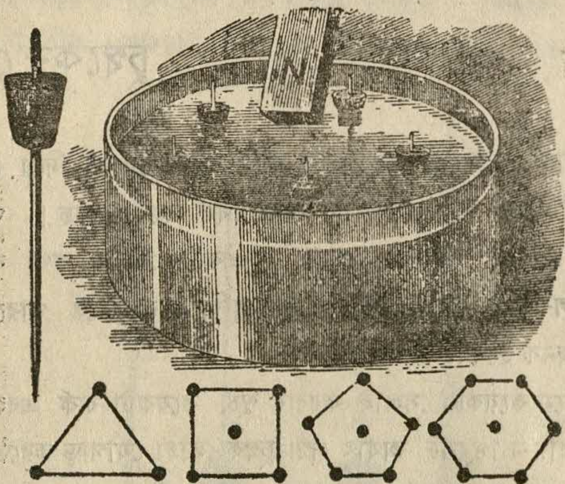
চুম্বকের খেলা

১.

চুম্বক-লোহা তোমাদের অপরিচিত নয়। চুম্বক-লোহা দিয়ে তোমরা অনেকেই হয়তো অনেক রকমের মজার খেলা করে দেখেছ! আজকে তোমাদের ওই রকমের আরও দু-একটা খেলার কথা বলবো। খেলাগুলি খুবই সহজ; কিন্তু একটু বুদ্ধি করে করতে পারলে বেশ কৌতুকজনক হবে।

প্রথমে কয়েকটা সেলাই করবার সূচ, কয়েকটা কর্ক এবং ছোট্ট একটা বার-ম্যাগ্‌নেট অর্থাৎ লম্বা চুম্বক-লোহা যোগাড় করতে হবে। বাজারে সাধারণত দুরকমের চুম্বক লোহা কিনতে পাওয়া যায়। এক রকমের চুম্বক-লোহা ঘোড়ার নালের মত বাঁকানো, আর এক রকম চ্যাপ্টা অথচ লম্বা। দু-ইঞ্চি কি আড়াই ইঞ্চি লম্বা একটা চুম্বক-লোহা হলেই কাজ চলবে। প্রথমে সূচগুলিকে চুম্বক-সূচে পরিণত করতে হবে। কেমন করে করবে জান তো? সূচের চোখের দিকটায় ধরে বার-ম্যাগনেট্‌খানার যে-কোন একটা প্রান্তের উপর দিয়ে সামনে থেকে পিছনের দিকে বার কয়েক আলতোভাবে ঘষ্‌ড়ে টেনে নাও। দেখবে—সূচটা চুম্বকের গুণ পেয়ে গেছে। সূচগুলিকে যে-কোন দিকে ধরে চুম্বক-লোহার যে-কোন প্রান্তে ঘষ্‌ড়ালেই চুম্বকের গুণ পাবে। তবে এই পরীক্ষাটার জন্যে সবগুলি সূচকে একই রকমে চুম্বকশক্তি-সম্পন্ন করতে হবে। এবার ছবির মত করে এক একটা কর্কের মধ্যে চুম্বক-সূচ এমনভাবে এফোঁড়-ওফোঁড় করে ঢুকিয়ে দাও যেন সূচের সরু মুখটা নীচের দিকে থাকে। একটা বড় পাত্রে জল ভর্তি করে কর্ক-আঁটা সূচগুলিকে জলে ভাসিয়ে দাও। দেখবে—একই রকম চুম্বক-মেরুর পরস্পর বিকর্ষণের ফলে সূচগুলি

দূরে দূরে সরে গিয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ জ্যামিতিক নক্সা রচনা করেছে। স্ূচের সংখ্যা যত বাড়বে, ততই বিভিন্ন রকমের জ্যামিতিক নক্সা গড়ে



বাঁ-দিকে – কর্কের ভিতরে এফোঁড়-ওফোঁড় করে স্থচ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।
ডানদিকে – জলভর্তি পাত্রে স্থচ-বেঁধা কর্কগুলি ভাসছে
নীচে – কয়েকটা জ্যামিতিক নক্সার নমুনা দেখানো হয়েছে

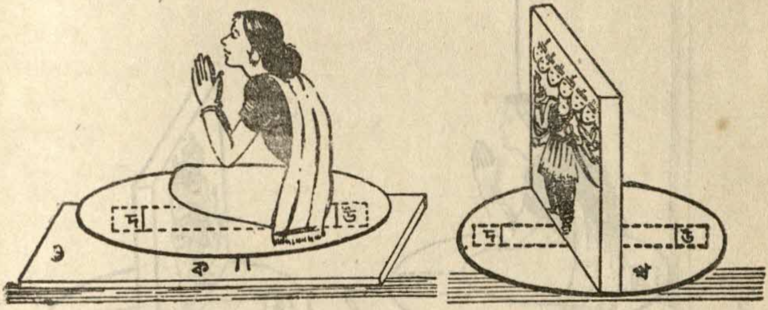
উঠবে। বার-ম্যাগ্‌নেটের যে-কোন এক প্রান্ত এই ভাসমান স্থচগুলির মধ্যস্থলে ধরলে জ্যামিতিক নক্সা বজায় রেখেই উত্তর বা দক্ষিণ মেরু অনুযায়ী স্থচগুলি দূরে সরে যাবে অথবা কাছে উপস্থিত হবে। কতকগুলি স্থচ ভাসালে কোন্‌ রকমের জ্যামিতিক নক্সা তৈরি হবে, পাত্রের নীচের ছবিতে তা দেখানো হয়েছে। পাত্‌লা কাগজ কেটে সৈন্য-সামন্ত বা জীবজন্তুর ছবি কর্কের উপর বসিয়ে দিলে খেলাটা আরও চিত্তাকর্ষক করতে পার।

২.

রামায়ণে তোমরা রাম, সীতা ও রাবণের কাহিনী পড়েছ। সীতা হিন্দু রমণীর আদর্শ। রামের প্রতি অবিচলিত অনুরাগ এবং রাবণের

প্রতি অপরিমেয় ঘৃণা সীতার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। চুম্বকের খেলার মধ্য দিয়ে সীতার এই বৈশিষ্ট্য চমৎকারভাবে দেখানো যেতে পারে। নীচের ছবি দুটো দেখলেই খেলার ব্যাপারটা অনায়াসে বুঝতে পারবে।

এক নম্বরের ক চিহ্নিত চিত্রে সূক্ষ্ম আলের উপর স্থাপিত মোটা কাগজের একখানা গোল চাক্‌তি। চাক্‌তিটার উপরে হাত-যোড়করা সীতার মূর্তি বসানো আছে। চাক্‌তিখানার তলায় ছোট্ট একটা



১নং চিত্র

সীতা রাবণের দিকে মুখ ঘুরিয়ে আছে

বার-মাগ্‌নেট অর্থাৎ লম্বা চুম্বক ঠিক মাঝখানে আড়াআড়িভাবে বসানো। চুম্বকের দক্ষিণ মেরু মূর্তির সামনে এবং উত্তর মেরু পিছনের দিকে আছে। মূর্তি ও চুম্বকসহ চাক্‌তিখানা অনায়াসেই আলের উপর ঘুরতে পারে। খ চিহ্নিত আর একখানা চাক্‌তির উপরেই হোক, কি কাঠের উপরেই হোক, আর একটা বার-ম্যাগ্‌নেট বসিয়ে তার উপরে ছবির মত করে একটা দেশলাইয়ের বাক্স বা ওই ধরনের এক টুকরো কাঠ বসিয়ে দিতে হবে। দেশলাইয়ের বাক্সের যে দিকটা চুম্বকের দক্ষিণ মেরুর দিকে আছে, সে দিকটায় রাবণের মূর্তি এঁকে দাও। যে দিকটা উত্তর মেরুর দিকে সে দিকটায় রামের মূর্তি আঁক। চুম্বক দুটোকে সুবিধামত কাগজ বা অন্য কিছু দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। তাহলেই খেলাটা আরও বেশী চিত্তাকর্ষক হবে। এবার রাবণের ছবিটা সীতার কাছে এনে বসিয়ে দাও। দেখবে—সীতা তার দিকে

মুখ ঘুরিয়ে পিছন ফিরেই বসে থাকবে। কিন্তু রামের ছবিটাকে তার দিকে বসিয়ে দেওয়া মাত্র সীতা রামের দিকে যোড়হাতে ঘুরে বসবে।

আলের উপর ঠিকভাবে 'ব্যালান্স' করে বসানোর অসুবিধা হলে তলায় আড়াআড়িভাবে স্থাপিত চুম্বকটা সমেত সীতার মূর্তিটাকে একগাছা সরু সুতোর সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখতে পার। এতেও ঠিক পূর্বের মত অবস্থাই হবে। ছু-নম্বরের গ ও ঘ চিহ্নিত চিত্রে ব্যবস্থাটা



২নং চিত্র

সীতা রামের দিকে মুখ করে আছে

দেখানো হয়েছে। কেবল সীতার মূর্তি দেখা যায় এরূপ ব্যবস্থা রেখে বাকী সবটাকে ঢেকে দেবে। এখানেও রামের মূর্তি কাছে আনা মাত্রই সীতা যোড়হাতে তার দিকে ঘুরে বসবে; কিন্তু রাবণের মূর্তিটাকে তার দিকে আনলেই মুখ ফিরিয়ে ঘুরে যাবে। কেন এমন হয়—সে কথাটা বোধহয় তোমাদের আর বিশেষ করে বুঝিয়ে বলতে হবে না। দুটো চুম্বক কাছাকাছি আনলে সম-মেরু পরস্পরকে দূরে ঠেলে দেয়; কিন্তু অসম-মেরু পরস্পরকে কাছে টেনে নেয়। অর্থাৎ উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরুকে এবং দক্ষিণ মেরু উত্তর মেরুকে আকর্ষণ করে। আবার উত্তর মেরু উত্তর মেরুকে এবং দক্ষিণ মেরু দক্ষিণ মেরুকে দূরে ঠেলে দেয়।

করে দেখ
দ্বিতীয় খণ্ড

সূচীপত্র

ফায়ার-অ্যালার্ম তৈরির সহজ ব্যবস্থা

রাত্রিবেলায় যখন সবাই ঘুমিয়ে থাকে, তখন কোন কারণে আগুন লাগলে বেশ ছড়িয়ে পড়বার আগে টের পাওয়া যায় না। তাছাড়া এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে দিনেই হোক, কি রাতেই হোক—আগুন ছড়িয়ে পড়বার আগে কারুর নজরে পড়বার সম্ভাবনা কম। আগুন লাগবার সঙ্গে সঙ্গে টের পাওয়া গেলে অনেক



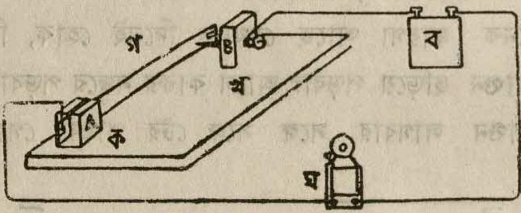
১নং চিত্র

ক্ষেত্রেই গুরুতর বিপদ এড়ানো সম্ভব হতে পারে। আগুন লাগবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টের পাওয়ার জন্যে তোমরা হয়তো ফায়ার-অ্যালার্মের ব্যবস্থার কথা শুনে থাকবে। ইচ্ছা করলে তোমরাও নিজের হাতে খুব সহজ উপায়ে এই রকমের ফায়ার-অ্যালার্ম তৈরি করে নিতে পারো। কী ভাবে তৈরি করতে হবে, সে কথা বলছি।

ফায়ার-অ্যালার্ম তৈরি করতে হলে দামী জিনিসের মধ্যে চাই কেবল একটা ইলেকট্রিক কলিং বেল, আর একটা ড্রাই ব্যাটারী। অন্য জিনিসের মধ্যে খানিকটা পিতল এবং টিনের পাত, কিছু ইলেকট্রিক তার, এক ফুট লম্বা তিন ইঞ্চি চওড়া একখানা কাঠ,

দেশলাইয়ের বাক্সের মাপের ছু-টুকরো চৌকো কাঠ আর লম্বা একটা পিতলের স্ক্রু দরকার।

আট ইঞ্চি লম্বা, আধ ইঞ্চি চওড়া করে পিতলের পাত থেকে একটা ফালি কেটে নাও। ঠিক ওই মাপের টিনের পাত থেকেও একটা ফালি কেটে নিতে হবে। এক নম্বরের ছবিতে যে-রকম দেখানো হয়েছে, পিতল ও টিনের ফালি ছু-খানার উভয় প্রান্তে সে-রকম খাঁজ কেটে নিয়ে ১নং ছবির নীচের চিত্রের মত ভাঁজ করে



২নং চিত্র

পাত ছু'খানা একত্রে জুড়ে দাও। রিভেট করে পাত ছু'খানা গায়ে গায়ে সমানভাবে মিলিয়ে দিলে ভাল হয়। এবার পাতখানাকে গরম করলেই দেখবে, সেটা টিনের পাত যেদিকে আছে সেদিকে ধনুকের মত বেঁকে যাচ্ছে। কারণ তাপ প্রয়োগে পিতল লোহার চেয়ে বেশী প্রসারিত হয়।

এবার লম্বা কাঠখানার উপরে কাঠের টুকরো ছু'খানা তলা থেকে স্ক্রু দিয়ে এঁটে বসাতে হবে। ছু-নম্বরের ছবিখানা ভাল করে লক্ষ্য কর। ক ও খ-চিহ্নিত কাঠের চৌকো টুকরো ছুটি কিভাবে বসানো হয়েছে তা সহজেই বুঝতে পারবে। ক-টুকরোটাকে একটু পাশ ঘেঁষে, আর খ-টুকরোটাকে একটু ভিতরের দিকে বসাতে হবে। ক-টুকরোটাকে উপর থেকে প্রায় নীচু অবধি সরু করাত দিয়ে চিরে দাও। ছবির মত করে পিতলের লম্বা স্ক্রুটা, খ-টুকরোটার গায়ে এমন ভাবে এফোঁড়-ওফোঁড় ঢুকিয়ে দিতে হবে যেন স্ক্রুটা কাঠখানার ছুদিকেই বেশ খানিকটা বাইরে বেরিয়ে থাকে।

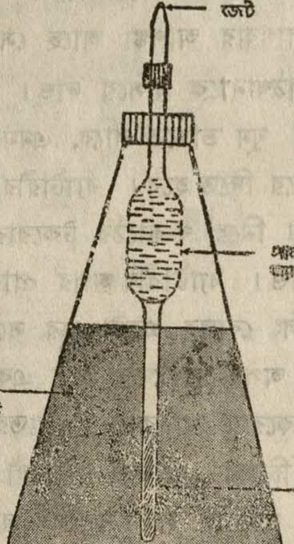
এবার গ-চিহ্নিত টিন ও পিতলের জোড়া পাতখানির এক প্রান্ত ক-কাঠখানার চেরার মধ্যে এমনভাবে চেপে বসিয়ে দাও যেন তার অপর প্রান্ত পিতলের স্ক্রুটার খুব কাছাকাছি থাকে, কিন্তু গায়ে ঠেকে না যায়। অবশ্য পিতলের স্ক্রুটা ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরিয়ে ফাঁক কম-বেশী করা যাবে। বসাবার সময় গ-চিহ্নিত পাতের টিনের দিকটা যেন ভিতরের দিকে, অর্থাৎ স্ক্রুটার কাছে থাকে।

যেখানে আগুন লাগবার আশঙ্কা আছে সেখানে কোন সুবিধা-মত জায়গায় এই কাঠখানাকে বসিয়ে দাও। কলিং বেলের শব্দ কানে যেতে পারে বা ঘুম ভাঙতে পারে, এমন কোন স্থানে কলিং বেল ও ব্যাটারী বসিয়ে দিতে হবে। ব্যাটারীর এক প্রান্ত থেকে এক গাছা তার টেনে নিয়ে খ-কাঠের টুকরোর পিতলের স্ক্রুটার মাথার দিকে জুড়ে দাও। ব্যাটারীর অপর প্রান্ত থেকে আর এক গাছা তার নিয়ে কলিং বেলের একটা স্ক্রুর সঙ্গে সংযোগ করতে হবে। কলিং বেলের অপর স্ক্রু থেকে আর এক গাছা তার নিয়ে ক-চিহ্নিত কাঠের টুকরোয় আটকানো পাতের প্রান্তভাগ যোগ করে দাও। ছ-নম্বর চিত্রের ব-চিহ্নিত ব্যাটারী ও ঘ-চিহ্নিত কলিং বেলের সঙ্গে তারের সংযোগ লক্ষ্য করলেই ব্যবস্থাটা অনায়াসে বুঝতে পারবে। ঘরে আগুন লাগলে উত্তাপ বৃদ্ধির ফলে গ-চিহ্নিত পাতখানা বেঁকে গিয়ে পিতলের স্ক্রুর সঙ্গে লেগে যাওয়া মাত্রই কলিং বেল বেজে উঠবে।

অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র

বাতাস না পেলে আগুন জ্বলে না এবং জ্বলন্ত আগুন থেকে বাতাসের সংস্পর্শ বিচ্ছিন্ন করলে আগুন নিভে যায়—একথা তোমরা সবাই জান।

ছোটখাটো অগ্নিকুণ্ড বা অগ্নিশিখার উপর ঢাকনা চাপা দিয়ে বায়ুর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে আগুন নেবানো যায় বটে, কিন্তু বিস্তৃত আগুন আয়ত্তে আনা যায় না। সে-সব ক্ষেত্রে ভেজা বালি ছড়িয়ে বাতাসের সংস্রব বিচ্ছিন্ন করে আগুন নেবানো হয়, অথবা আগুনের উপর বেকিং পাউডার (বেশীর ভাগ বাইকার্বোনেট অব সোডা, অর্থাৎ খাবার সোডা) ছড়িয়ে দেওয়া হয়। গরম হওয়ার ফলে বেকিং



আগুন-নেবানো যন্ত্র

পাউডার থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস নির্গত হয়ে আগুন নিবিয়ে দেয়। কিন্তু সবক্ষেত্রেই বেকিং পাউডার ছড়িয়ে আগুন নেবানো সম্ভব নয়, তবে প্রচুর পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের ব্যবস্থা থাকলে যথাসময়ে আগুন আয়ত্তে আনা সম্ভব। কিভাবে এই ব্যবস্থা করা যায় তার একটা সহজ উপায়ের কথা বলছি। চেষ্টা করলে তোমরা অনায়াসে এই রকমের একটা যন্ত্র তৈরি করে হাতের কাছে রাখতে পারো।

ধাতুর পাত দিয়ে ফ্লাস্কের মত সরু মুখওয়ালা মাঝারি গোছের একটা পাত্র তৈরি করে নাও। পাত্রটার ভিতরের দিকে পিচের আস্তরণ দেওয়া থাকবে। পাত্রটা যতখানি খাড়াই প্রায় ততখানি লম্বা একটা কাচের নল সংগ্রহ করো। গ্লাস-ব্লোয়ারের সাহায্য নিয়ে কাচের নলটার এক মুখ বন্ধ করে তার মধ্যে একটা সীসার তার পুরে দিতে হবে। তারপর নলটাকে মাঝামাঝি বেশ পাতলা করে ফুলিয়ে নীচের মুখ বন্ধ করে সালফিউরিক অ্যাসিড ভর্তি করো। নলের উপরের খোলা মুখটাকে ড্রপারের মত স্থূচালো করে দাও।

এবার পাত্রটার গলার প্রায় কাছাকাছি সাধারণ কাপড় কাচা সোডার তীব্র দ্রবণ ভর্তি করে কাচের নলটাকে ছিপির সাহায্যে তার মধ্যে বসিয়ে দাও। ছবিটা ভাল করে দেখে নাও, কিভাবে যন্ত্রটা তৈরি করতে হবে তা সহজেই বুঝতে পারবে।

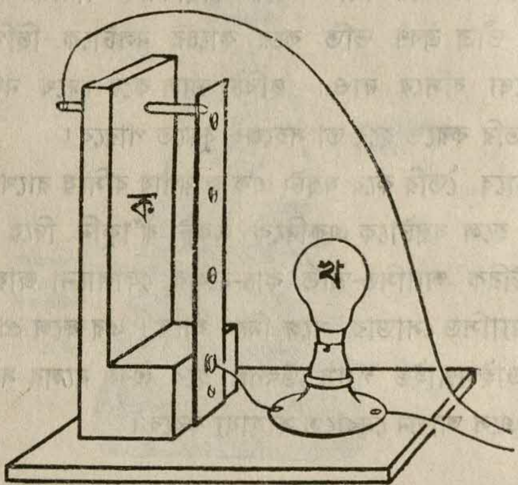
এভাবে তৈরি করে যন্ত্রটা এক জায়গায় বসিয়ে রাখো। প্রয়োজন উপস্থিত হলে যন্ত্রটাকে একদিকে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে কাৎ করলেই সালফিউরিক অ্যাসিড-ভর্তি কাচ-নলের ফোলানো জায়গাটা ভেঙে গিয়ে অ্যাসিড সোডার সঙ্গে মিশে যাবে। এর ফলে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হবে এবং নলের সরু মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসে আগুন নেবাতে সাহায্য করবে।

নমুনা থার্মোস্ট্যাট তৈরির কৌশল

ইনকিউবেটর বা ওই রকমের অন্য কোন আবদ্ধ কুঠরীতে ইচ্ছামত নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রাখতে হলে থার্মোস্ট্যাটের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন। নমুনা হিসাবে এরূপ একটা থার্মোস্ট্যাট তোমরা খুব সহজেই তৈরি করে দেখতে পারো। এর জন্যে দরকার হবে একটা

কাঠের স্ট্যাণ্ড, টিন আর পিতলের তু'খানা পাতলা পাত, কার্বন-পেন্সিল, কিছু সরু ইলেকট্রিক তার, ১২-ভোল্ট ২৬-ওয়াটের একটা ইলেকট্রিক বাল্ব, আর কিছু স্ক্রু ও বল্টু।

টিন ও পিতলের পাত থেকে লম্বা করে তুটো সরু ফালি কেটে নিয়ে একটার উপর আরেকটা রেখে বল্টু দিয়ে একসঙ্গে এঁটে দাও। ছবির ক-চিহ্নিত জিনিসটার মত একটা কাঠের স্ট্যাণ্ড তৈরি করতে হবে। এই কাঠের স্ট্যাণ্ডের উপরের দিকে একটা ছিদ্র করে ছবির মত ব্যবস্থায় কার্বন-পেন্সিল বসিয়ে দাও। এবার পিতল ও টিনের জোড়া ফালিটাকে খাড়াভাবে স্ট্যাণ্ডের নীচের দিকে এঁটে দাও



থার্মোস্ট্যাট

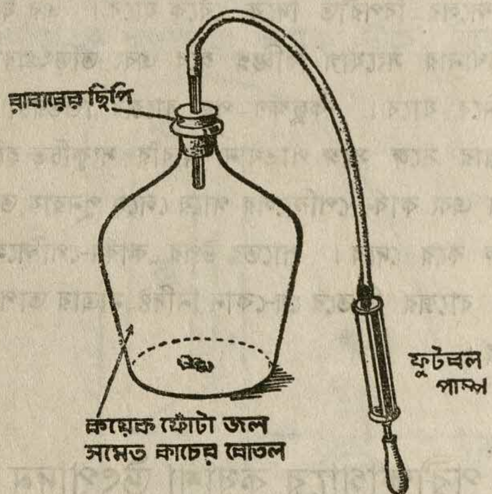
পিতলের পাতটা যেন কার্বন-পেন্সিলের গায়ে লেগে থাকে। এবার ১২-ভোল্টের বাতিটাকে একখানা কাঠের বোর্ডের উপর বসিয়ে পাতের সঙ্গে সংলগ্ন একটা তার বাতির এক প্রান্তে সংযোগ করে দাও। কার্বন-পেন্সিল সংলগ্ন একগাছা তারের প্রান্ত এবং বাতির অপর প্রান্ত সংলগ্ন আরেক গাছা তারের প্রান্ত ১২-ভোল্টের ব্যাটারীতে লাগিয়ে দিলেই তড়িৎ প্রবাহিত হয়ে বাতিটি জ্বলে উঠবে। ছবির

খ-চিহ্নিত অংশ দেখে নাও। এবার এই সম্পূর্ণ জিনিসটার উপর—নীচের দিক খোলা একটা কাঠের বাক্স চাপা দাও। ভিতরের অবস্থা দেখবার জন্যে বাক্সটার গায়ে ছোট্ট একটা ছিদ্র রাখা দরকার। বাতি জ্বলবার ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই বাক্সের ভিতরটা বেশ গরম হয়ে উঠবে। উত্তপ্ত হওয়ার ফলে সঙ্গে সঙ্গে টিন ও পিতলের জোড়া পাতখানাও বাড়তে থাকবে। কিন্তু পিতলের পাতখানা টিনের পাতের চেয়ে বেশী বাড়বার ফলে খাড়াভাবে বাড়তে না পেরে কার্বন-পেন্সিলের বিপরীত দিকে বেঁকে যাবে। এর ফলে কার্বনের সঙ্গে পাতখানার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবে এবং তড়িৎপ্রবাহ বন্ধ হয়ে বাতিটা নিবে যাবে। কিছুক্ষণ পর বাক্সের ভিতরটা অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাতখানা আবার সংকুচিত হয়ে যথাস্থানে ফিরে যাবে এবং কার্বন-পেন্সিলের গায়ে লেগে পুনরায় তড়িৎপ্রবাহের পথ উন্মুক্ত করে দেবে। পাতের উপর কার্বন-পেন্সিলের চাপ কম বেশী করে বাক্সের ভিতরে যে-কোন নির্দিষ্ট মাত্রায় তাপ বজায় রাখা যেতে পারে।

পরীক্ষাগারে কুয়াশা উৎপাদন

শীতকালে সবাই তোমরা মাঝে মাঝে কুয়াশা হতে দেখেছ। সময় সময় কুয়াশা এত ঘন হয় যে, কাছের মানুষও চেনা যায় না। এই কুয়াশা হয় কেন, বলতে পার? হঠাৎ ঠাণ্ডা হলেই বাতাসের জলীয় বাষ্প জমে গিয়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলবিন্দুতে পরিণত হয় এবং কুয়াশার সৃষ্টি করে। শিল্পাঞ্চলে যেখানে কলকারখানার ধোঁয়া বেশী অথবা যে-সব জায়গায় ধূলাবালির আধিক্য, সেখানেই সাধারণত কুয়াশা খুব ঘন হয়ে থাকে। খুব সহজ ব্যবস্থায় একটা পরীক্ষা করে তোমরাও কুয়াশা সৃষ্টি করে দেখতে পারো।

পরীক্ষার জন্যে সরু মুখওয়ালা খুব মোটা একটা কাচের বোতল জোগাড় করতে হবে। সালফিউরিক অ্যাসিড প্রভৃতি রাখবার জন্যে সরুমুখ জালার মত এক রকমের বোতল পাওয়া যায়। এই বোতলকে ইংরেজীতে বলে কারবয়। এই রকমের একটা কারবয়ের মুখে আঁটবার জন্যে একটা রাবারের ছিপি, চার-পাঁচ ইঞ্চি লম্বা সরু এক টুকরো কাচের নল এবং খানিকটা রাবারের নল দরকার; আর জোগাড় করতে হবে একটা ফুটবল-পাম্প।



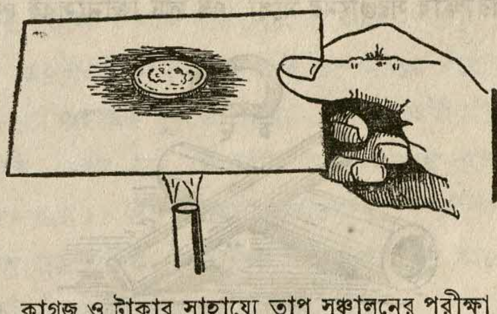
কুয়াশা-উৎপাদক যন্ত্র

রাবারের ছিপিটার মধ্যস্থলে এফোঁড়-ওফোঁড় ছিদ্র করে তার মধ্য দিয়ে কাচের নলটা পরিয়ে দাও। তারপর কাচের নলের সঙ্গে রাবারের পাইপটি পরিয়ে অপর মুখটি ফুটবল-পাম্পের সঙ্গে এঁটে দাও। এবার বোতলটার মধ্যে কয়েক ফোঁটা জল দিয়ে কাচের নল-পরানো ছিপিটা বোতলের মুখে এঁটে নিয়ে পাম্পের সাহায্যে বোতলের ভিতরে বেশ খানিকটা হাওয়া ঢুকিয়ে দিতে হবে। তারপর বোতলের মুখ থেকে ছিপিটাকে একটানে খুলে নিলেই বোতলের বাতাস অকস্মাৎ প্রসারিত হওয়ার ফলে তাপ কমে যাবে

এবং বোতলের ভিতরে জলীয় বাষ্প জমে গিয়ে অতি সূক্ষ্ম জলবিন্দুর আকার ধারণ করে কুয়াশার সৃষ্টি করবে। বোতলের ভিতরে যদি সামান্য একটু সিগারেটের ধেঁায়া দেওয়া হয় তাহলে বোতলের ভিতর ঘন কুয়াশার সৃষ্টি হবে।

তাপ সঞ্চালনের পরীক্ষা

লোহা, তামা প্রভৃতি ধাতব পদার্থমাত্রেরই কম-বেশী তাপ সঞ্চালনের ক্ষমতা আছে। কিন্তু রেশম, পশম, কাঠ, কাগজ প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থের তাপ সঞ্চালনের ক্ষমতা নেই। ধাতব পদার্থের তাপ সঞ্চালনের ক্ষমতা আছে বলেই খনির মধ্যে বিস্ফোরণ এড়াবার জন্যে তারের জালের সাহায্যে ডেভিস্ সেফ্‌টি ল্যাম্প তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল—একথা বোধহয় তোমরা সবাই জান। ধাতব পদার্থের তাপ সঞ্চালনের ক্ষমতা পরীক্ষা তোমরা অবশ্য অনেক রকমেই করে দেখতে পারো; কিন্তু তোমাদের এখন তাপ সঞ্চালনের একটা কৌতুকপ্রদ পরীক্ষার কথা বলছি। সহজেই তোমরা পরীক্ষাটা করে দেখতে পারবে।



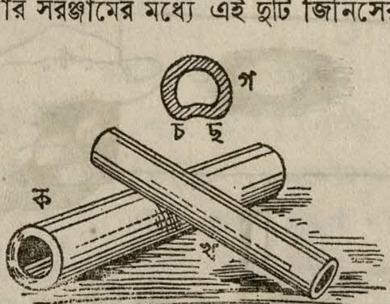
কাগজ ও টাকার সাহায্যে তাপ সঞ্চালনের পরীক্ষা

পোস্টকার্ডের মত একখানা সাদা কাগজের উপর একটা টাকা রাখো। টাকাসমেত কাগজটাকে গ্যাস-বার্নার বা স্পিরিট ল্যাম্পের খানিকটা উপরে ধরে, এদিক-ওদিক সরিয়ে এমনভাবে ঘোড়াও যেন

আগুন ধরে না যায়, অথচ আগুনের তাপে কাগজটা প্রায় কালো বা বিবর্ণ হয়ে যায়। এবার আগুনের উপর থেকে টাকাটা সরিয়ে নিলেই দেখতে পাবে, সম্পূর্ণ কাগজটা বিবর্ণ হলেও টাকাটা যেখানে ছিল সে জায়গাটা মোটেই পোড়ে নি—সম্পূর্ণ সাদা রয়ে গেছে। ধাতু-নির্মিত টাকার ভিতর দিয়ে তাপ সঞ্চালিত হওয়ার ফলেই সে জায়গাটা পুড়তে পারে নি। ছবিটা দেখে নাও, পরীক্ষাটা কেমন করে করতে হবে সহজেই বুঝতে পারবে।

ঠাণ্ডা ও গরম ধাতব নলের পরস্পর সংস্পর্শে সুর উৎপাদন

এই পরীক্ষাটা খুবই সহজ—অনায়াসেই তোমরা করে দেখতে পারবে। পরীক্ষার জন্যে প্রায় ইঞ্চিখানেক মোটা ও ৫-৬ইঞ্চি লম্বা এক টুকরো সীসার পাইপ, ৫-৬ইঞ্চি লম্বা একটা পুরু পিতলের নল জোগাড় করতে হবে। পিতলের নলটা বাইরের দিকে প্রায় ¾ ইঞ্চি মোটা হলেই চলবে। পরীক্ষার সরঞ্জামের মধ্যে এই দুটি জিনিসেরই দরকার।

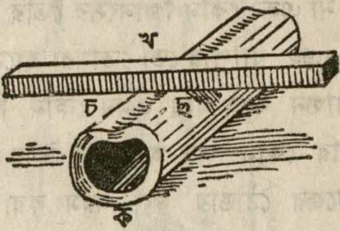


১নং চিত্র

সীসার পাইপটা যাতে গড়িয়ে যেতে না পারে সেজন্যে একটা দিক বরাবর একটু চ্যাপ্টা করে নিয়ে উপরের দিকটা ঘষে মেজে

বেশ মসৃণ করতে হবে। পিতলের নলটারও একটা দিকের খানিকটা উখায় ঘষে পাতলা করে নিয়ে হাতুড়ির ঘা দিয়ে বা পাঞ্চিং মেসিনে চেপে লম্বালম্বি একটা খাঁজ করে দিতে হবে। এর ফলে নলের মুখটাকে ১ নম্বরের গ চিত্রের মত দেখাবে, অর্থাৎ নলের বাইরের দিকে চ ও ছ-চিহ্নিত স্থানে দুটো খাঁজের দু পাশে উঁচু পাড়ের মত দেখাবে।

এবার খ- চিহ্নিত পিতলের নলটাকে গরম করে ক-চিহ্নিত সীসার পাইপটার উপর ১ নম্বরের ছবির মত করে বসিয়ে দাও। বসাবার সঙ্গে সঙ্গেই পিতলের নলটা অতি দ্রুতগতিতে নিয়মিতভাবে কাঁপতে



২নং চিত্র

থাকবে। কাঁপুনিটা অবশ্য চোখে দেখা যাবে না; কিন্তু দ্রুত কম্পনজনিত একটা সুস্পষ্ট স্বর শুনতে পাবে। গরম নলটা বসিয়ে দেবার পর কোন কারণে যদি সেটা না কাঁপে, অর্থাৎ শব্দ না শোনা যায় তবে একটুখানি নাড়িয়ে দিলেই কম্পন শুরু হবে। কেন এমন হয়, সে কথা সহজেই বুঝতে পারো। গরম নলটা সীসার পাইপের যে জায়গায় সংলগ্ন হয়, সেখানটা অতি সামান্য হলেও একটুখানি উঁচু হয়ে ওঠে। উঁচু হওয়াটা দ্রুতগতিতে পর্যায়ক্রমে একবার এদিকে, আবার ওদিক হয় বলে নলটা কাঁপতে থাকে এবং তার ফলেই একটানা একটা সুর শুনতে পাওয়া যায়।

পরীক্ষাটা অন্যভাবেও করা যেতে পারে। ২ নম্বরের ছবিখানা দেখে নাও। এখানে পূর্বের পরীক্ষার পিতলের নলের পরিবর্তে ক-চিহ্নিত সীসার পাইপটার উপরের দিকে চ ও ছ-চিহ্নিত দুটি উঁচু

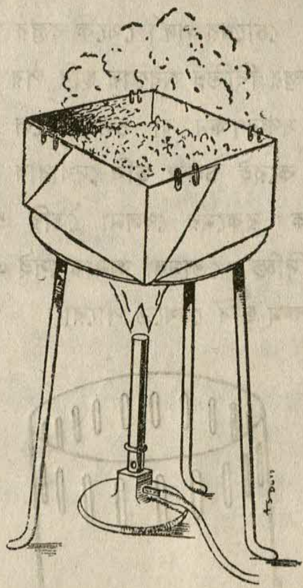
পাড় তোলা হয়েছে। এর উপরে যদি খ-চিহ্নিত জিনিসটির মত পিতলের এক খণ্ড চ্যাপ্টা বাঁট গরম করে রাখা যায় তবে ঠিক পূর্বের পরীক্ষার মতই বাঁটটা কাঁপতে থাকবে। অবশ্য এর কম্পন হবে অনেকটা মন্থর গতিতে। কাজেই সুরটা তীক্ষ্ণ না হয়ে গম্ভীর শোনাবে।

কাগজের ঠোঙায় জল গরম করা

আগুনে পোড়ে না এমন কোন জিনিসের তৈরি পাত্রে করেই লোকে জল গরম করে—এই ব্যাপার তো তোমরা হামেশাই দেখতে পাও। কিন্তু সহজেই আগুন ধরে যায় এমন কোন জিনিস—যেমন ধরো কাগজ দিয়ে তৈরি কোন পাত্র আগুনের উপর রেখে জল গরম করা যায় কি? কাগজের ঠোঙায় জল গরম করা যায়, তোমাদের অনেকেই হয়তো একথা বিশ্বাস করবার ভরসা পাবে না; কারণ তোমরা তো আর ঠোঙায় জল গরম করবার চেষ্টা করে দেখ নি। কিন্তু এতে অবিশ্বাস করবার মত কিছুই নেই; একবার পরীক্ষা করে দেখলেই সন্দেহ দূর হয়ে যাবে।

একটু মোটা কাগজ ভাঁজ করে চৌকো একটা ঠোঙা তৈরি করো। ঠোঙাটাকে ক্লিপ দিয়ে, না হয় আঠা দিয়েও জুড়তে পারো। কিন্তু ক্লিপ ছাড়া আঠা দিয়ে জুড়লে জলে ভিজে ঠোঙা খুলে গিয়ে গরম জল ছড়িয়ে পড়লে বিপদ ঘটতে পারে। ঠোঙায় জল ভর্তি করে সেটাকে এবার ছবির মত করে একটা স্ট্যাণ্ডের উপর বসিয়ে দাও। কাগজ ভিজে গিয়ে জলের ভারে ঠোঙার তলা ফেঁসে যাবার আশঙ্কা থাকলে সরু তারের জালতির উপর সেটাকে বসিয়ে দিতে পারো। এবার ঠোঙার নীচে গ্যাস বার্নার বা স্পিরিট ল্যাম্প জ্বেলে জল ফোটাতে থাকো। দেখবে, জল ফুটে বাষ্প উঠছে, কিন্তু কাগজের

ঠোঙা একটুও পোড়ে নি। যে-কোন দাহ্য পদার্থই হোক-না কেন, আগুন ধরবার আগে সেটার যথেষ্ট উত্তপ্ত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ঠোঙার যে জায়গাটায় আগুনের আঁচ লাগছে, সে



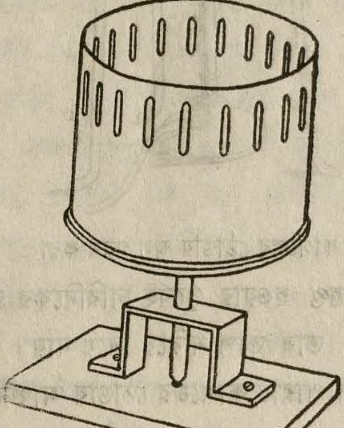
কাগজের ঠোঙায় জল গরম করা

জায়গাটা যথেষ্ট উত্তপ্ত হওয়ার পূর্বেই চারিদিকের অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা জল সঞ্চালিত হয়ে তার তাপ সরিয়ে নিয়ে যায়। কাজেই উপযুক্ত মাত্রায় উত্তপ্ত হতে না পারায় কাগজের ঠোঙায় আগুন ধরে না।

জীবনচক্র

যে-কোন জিনিসের বিভিন্ন অবস্থার ছবি দ্রুতগতিতে পর পর চোখের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে সেটাকে চলন্ত পদার্থ বলে মনে হবে। সিনেমার পর্দায় তোমরা যে-সব সচল ছবি দেখ, তার মূল

রহস্য এখানেই। অর্থাৎ ব্যাপারটা হলো এই যে, যে-কোন পদার্থের উপরই আমাদের দৃষ্টি পড়ুক-না কেন, তা থেকে চোখ ফেরাবার সঙ্গে সঙ্গেই তার ছাপ আমাদের চোখ থেকে মুছে যায় না—সামান্য কিছুক্ষণ স্থায়ী হয়। চোখের পর্দা থেকে বস্তুর ছাপ মুছে যেতে-না যেতেই যদি সেই বস্তুর বিভিন্ন অবস্থার ছবি পর পর দৃষ্টিপথে আনা যায়, তাহলে তাকে সঞ্চরণক্ষম বা চলন্ত বলে মনে হবে। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করেই চলন্ত ছবি দেখাবার জন্যে জিওট্রোপ বা জীবনচক্র নামে এক রকমের খেলনা তৈরি হয়েছিল। যন্ত্রটা তৈরির উপায় বলে দিচ্ছি—তোমরা অনায়াসেই এই রকমের জীবন-চক্র তৈরি করে সঞ্চরণক্ষম ছবি দেখতে পারো।



জীবনচক্র

ছয় ইঞ্চি খাড়াই ও চার ইঞ্চি ব্যাসের একটা কাগজের ড্রাম তৈরি করো। ড্রামটার উপরের দিকে চারধারে পরপর সমান দূরত্বে লম্বা অথচ সরু কতকগুলি ফাঁক কেটে নাও। ড্রামটার ভিতরের দিকে, সরু ফাঁকগুলির নীচে, কোন কিছু কাজে ব্যস্ত মানুষ অথবা কোন জন্তুর বিভিন্ন অবস্থার ছবি পর পর এঁটে দাও। ড্রামটার

মুখের মাপ অনুযায়ী একখানা পাতলা কাঠের চাক্‌তি তৈরি করে সেটার ঠিক কেন্দ্রস্থলে ফুটো করে তাতে সরু একটা রড এঁটে তার অপর মুখটা সূচলো করে নাও। রডসমেত চাক্‌তিটাকে ড্রামের নীচের দিকে চেপে বসিয়ে দাও। রডটা যেন বাইরের দিকে থাকে। টিনের একখানা সরু ফালি বাঁকিয়ে নিয়ে একখানা কাঠের উপর স্ক্রু এঁটে বসিয়ে দিতে হবে। টিনের এই ফালিটার ঠিক মাঝখানটায় রডের মাপমত একটা ছিদ্র করে ড্রামসমেত ওই ছিদ্রের মধ্যে ছবির মত করে বসিয়ে দাও। রডের সূচলো মুখটা কাঠের উপর আলতো-ভাবে থাকবার ফলে ড্রামটাকে একবার ঘুরিয়ে দিলে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরতে থাকবে। এবার ঘূর্ণায়মান ড্রামটার লম্বা ফাঁকের মধ্য দিয়ে ঠিক একদিকে তাকিয়ে থাকলেই মনে হবে, ড্রামের ভিতরের দিকে লাগানো ছবিগুলি যেন জীবন্ত ছবির মতো নড়াচড়া করছে। একই ব্যক্তির বিভিন্ন অবস্থার পর পর তোলা ফোটোগ্রাফের ছবি এভাবে সাজিয়ে নিলে নিখুঁত জীবন্ত ছবি দেখা যাবে।

ডিমের লাট্টু

আমেরিকা আবিষ্কারের পর এক ভোজসভায় কলম্বাসকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল—বলুন তো আমেরিকা আবিষ্কারে এমন কী কৃতিত্ব আছে, যাতে আপনি অত বড় একটা গৌরবের অধিকারী হতে পারেন? এ কাজ তো যে সেই করতে পারতো! কলম্বাস সে কথার জবাব না দিয়ে সেই লোকটিকে একটি ডিম দিয়ে বললেন—ডিমটাকে টেবিলের উপর খাড়াভাবে দাঁড় করিয়ে রাখুন তো! কিন্তু সে কোন রকমেই ডিমটাকে দাঁড় করাতে সমর্থ হলো না। একে একে সবাই চেষ্টা করলো বটে, কিন্তু কেউ কৃতকার্য হলো না। কলম্বাস তখন ডিমটাকে নিয়ে তার একটা দিক ভেঙে ফেলে

সেটাকে টেবিলের উপর দাঁড় করিয়ে দিলেন। সবাই তখন বললো —এ আর কি হলো, যে কেউই তো এভাবে ডিমটাকে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারতো! কলম্বাস বললেন—হ্যাঁ, সবাই পারতো বটে, কিন্তু উপায়টা দেখিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত কেউ সেটা করতে পারেন নি।



১নং চিত্র

কলম্বাস ডিমটার একদিক ভেঙে সেটাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু ডিমটাকে না ভেঙেও যে কিছুক্ষণের জন্যে দাঁড় করিয়ে রাখা যায়, কলম্বাসের বোধ হয় সে উপায়টা জানা ছিল না। সেই উপায়টা তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি। একটু অভ্যাস করলেই ডিমটাকে না ভেঙেও টেবিলের উপর দাঁড় করিয়ে রাখতে পারবে।

একটা ডিম নিয়ে খোলাটার দু-দিকে দুটো ছিদ্র করো। একদিকের ছিদ্রে মুখ দিয়ে জোরে ফুঁ দাও। ডিমের চট্‌চটে তরল পদার্থটা প্রথমে বেরিয়ে আসবে। তারপর বেশ কয়েকবার ঝাঁকুনি দিয়ে আবার জোরে ফুঁ দাও। এবার হলদে পদার্থটা বেরিয়ে আসবে। এভাবে ভিতরের সব-কিছু বের করে ফেলবার পর মোম দিয়ে বেশ মসৃণভাবে ছিদ্র দুটো বন্ধ করে ডিমটাকে টেবিলের উপর

রাখা ডিমটা শয়ানভাবেই পড়ে থাকবে। এবার দু-আঙুলে ধরে হেচ্‌কা একটা মোচড় দিয়ে সেটাকে ঘুরিয়ে দাও। এক নম্বরের ছবি দেখ। শয়ানভাবে ঘোরবার মুখেই ডিমটা হঠাৎ খাড়া হয়ে উঠবে এবং লাট্টুর



২নং চিত্র

মত খাড়াভাবেই ঘুরতে থাকবে। মোচড় দিয়ে ঘোরাবার কায়দাটা ভালভাবে আয়ত্ত করতে পারলে শয়ানভাবে ঘূর্ণায়মান ডিমটার লাট্টুর মত খাড়া হয়ে ওঠবার ব্যাপারটাকে খুবই কৌতুকাবহ মনে হবে। ২নং চিত্র দেখো।

বর্শা ছোড়বার গুল্‌তি

তোমাদের অনেকেরই হয়তো মাছ ধরবার উৎসাহ আছে এবং মাছ ধরবার জন্যে ছিপ ব্যবহার করে থাক। কিন্তু অনেক রকম অসুবিধার জন্যে অনেকে ছিপ ব্যবহার পছন্দ করে না। যারা ছিপ ব্যবহার পছন্দ করে না অথচ মাছশিকারে উৎসাহী, তাদের জন্যে সহজসাধ্য এক রকম যন্ত্র তৈরির কথা বলছি। প্রায় ফুটদেড়েক লম্বা নলের মত

একটা যন্ত্রের মধ্য দিয়ে বেশ দূর থেকে বর্শা ছুড়ে অতি সহজেই মাছ শিকার করতে পারবে।

যন্ত্রটা বিশেষ কিছুই নয়। ফুটদেড়েক লম্বা গোলাকার একখণ্ড কাঠের ভিতর দিয়ে বরাবর বেশ মোটা একটা ছিদ্র করে নাও। ছিদ্র করবার পর কাঠখানা একটা নল বা পাইপের মত হবে। এই কাঠের নলের এক প্রান্তে কাটিমের মত করে ছিদ্র-করা একখানা চাক্‌তি

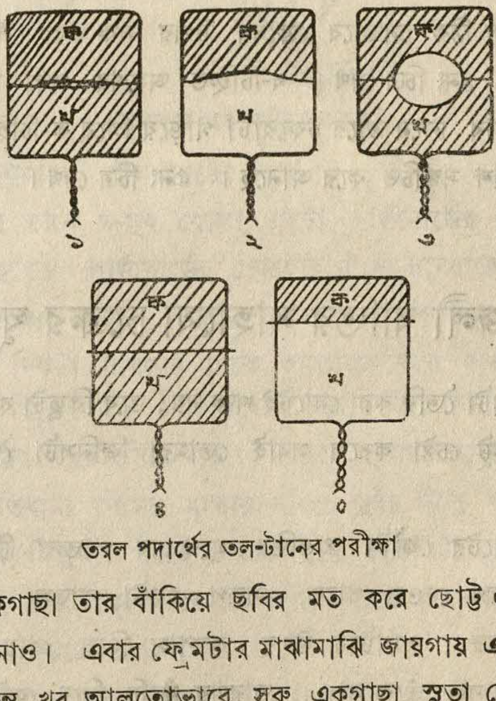


বর্শা ছোড়া গুলতি

জুড়ে দিতে হবে; অথবা সম্পূর্ণ কাঠখানাকে লেদ যন্ত্রে কেটেও নিতে পার। হাতে ধরবার সুবিধার জন্যে কাঠের নলটার সামনের দিকের খানিকটা অংশ একটু মোটা রাখবে। ছবিটা দেখেই বুঝতে পারবে —নলটা কিভাবে তৈরি করতে হবে। তারপর চাকতিখানার পিছনে বেশ লম্বা ও পুরু একটা রাবারের ফিতা জুড়ে দাও। এবার ওই নলের ভিতর তীক্ষ্মমুখ ছোট্ট বর্শা গলিয়ে দিয়ে পাখি মারা গুল্‌তির মত করে ছুড়ে অনায়াসেই মাছ-শিকারে সাফল্য লাভ করতে পারবে।

তরল পদার্থের তল-টানের পরীক্ষা

এক ফোঁটা জল বা এক বিন্দু পারা সর্বদাই গোল হয়ে থাকে কেন? সব রকম তরল পদার্থের উপরিভাগই যেন খুব পাতলা একটা পর্দার মত। এই পর্দা তার আয়তন যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করবার জন্যই চেষ্টা করে। একেই বলা হয় তল-টান, ইংরেজীতে বলে Surface tension। এই তল-টানের জন্যেই একবিন্দু পারা বা এক ফোঁটা জল গোলাকৃতি ধারণ করে। বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে তরল পদার্থের উপরিভাগের এই সঙ্কোচন ক্ষমতা, অর্থাৎ তল-টান প্রত্যক্ষ করতে পার। এই রকমের একটা পরীক্ষার কথা বলছি।



তরল পদার্থের তল-টানের পরীক্ষা

সরু একগাছা তার বাঁকিয়ে ছবির মত করে ছোট্ট একটা ফ্রেম তৈরি করে নাও। এবার ফ্রেমটার মাঝামাঝি জায়গায় এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত খুব আল্‌তোভাবে সরু একগাছা সুতা বেঁধে দাও। সুতাটার মাঝখানে আল্‌গা একটা ফাঁস রেখে দেবে। সুতাবাঁধা

ফ্রেমটাকে সাবানের জলে ডুবিয়ে নিলেই ফ্রেমটা জুড়ে একটা সাবান-জলের পাতলা পর্দা তৈরি হবে। ১নং চিত্র দেখ। এবার সাবান-জলের পর্দার খ-চিহ্নিত অংশটাকে ছিঁড়ে দাও। দেখবে, ক-চিহ্নিত অংশের সাবান-জলের পর্দা আল্‌তোভাবে-বাঁধা সুতাটাকে টেনে নিয়ে ধনুকের আকারে টান করে বাঁকিয়ে রেখেছে। ২নং চিত্র দেখ।

ফ্রেমটাকে আবার সাবান-জলে ডুবিয়ে নাও। এবার সুতার ফাঁসের ভিতরের অংশটার পর্দা ছিঁড়ে দাও। চারদিক থেকেই পর্দার সমান টানের ফলে সুতার ফাঁসটা এবার গোল হয়ে ছড়িয়ে পড়বে। ৩নং চিত্র দেখ।

ফ্রেমে-বাঁধা সুতাটা এবার খুলে নাও। সাবান-জলে ডুবিয়ে ফ্রেমটার মধ্যে পর্দা তৈরি কর। ফ্রেমটাকে শয়ানভাবে ধরে সুতাটা যেভাবে ছিল ঠিক সেভাবে ফ্রেমের উপর সরু এবং সোজা একখণ্ড তার রাখ। ৪নং চিত্র দেখ। খ-চিহ্নিত অংশের পর্দা ছিঁড়ে দাও। দেখবে, পর্দার টানে তারে টুকরোটা গড়িয়ে গিয়ে ক-চিহ্নিত অংশের আয়তন ক্রমশ সঙ্কুচিত করে আনছে। ৫নং চিত্র দেখ।

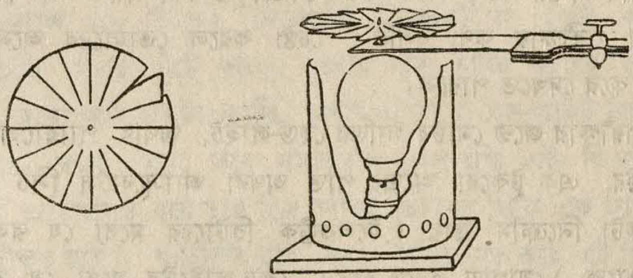
বিজলী বাতির সাহায্যে চক্রের ঘূর্ণন

এই যন্ত্রটা তৈরি করা মোটেই শক্ত নয়; তবে কিছুটা ঝঞ্ঝাট আছে বটে! একটু চেষ্টা করলে সবাই তোমরা জিনিসটা তৈরি করতে পারবে।

সিগারেটের কৌটা প্রভৃতির মুখে যে পাতলা টিনের পর্দার একটা আবরণ দেওয়া থাকে, সেরূপ একটা পাতলা টিনের পর্দা যোগাড় কর। পর্দাটার উপর কম্পাস দিয়ে প্রায় দেড় ইঞ্চি ব্যাসার্ধের বৃত্ত এঁকে নাও। তারপর কাঁচি দিয়ে সেটাকে গোল করে কেটে ফেল এবং কেন্দ্রস্থলে একটা সূক্ষ্ম ছিদ্র কর। চাক্‌তি-

খানাকে এবার বাঁ-দিকের চিত্রানুযায়ী পাখার ব্লেডের মত সমান ভাগে কয়েকটি অংশে কেটে নাও এবং প্রত্যেকটি ব্লেডকে ৪৫° ডিগ্রি কোণ করে বাঁকিয়ে দাও। সবগুলির বাঁক যেন সমান হয়, নচেৎ ভারসাম্য রক্ষা করা হবে না।

একটা গ্রামোফোনের পিনের সূচালো ডগাটা উপরের দিকে রেখে গোড়ার দিকটা রাং-ঝাল দিয়ে সরু একখানা পিতলের লম্বা পাতের একপ্রান্তে বসিয়ে দাও।



বাতির উপরে ঘূর্ণায়মান যন্ত্র

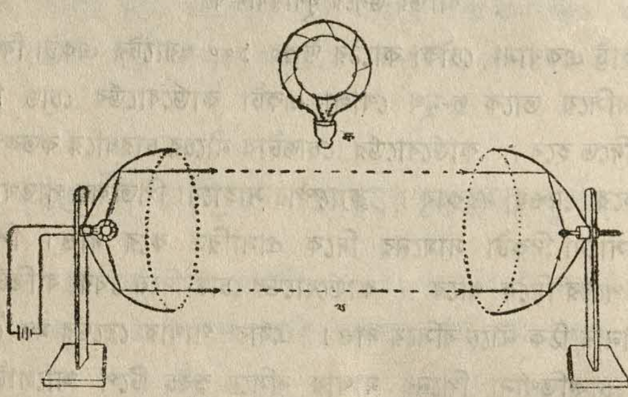
ছোট্ট একখানা চৌকা কাঠের উপর ১০০ ওয়াটের একটা বিজলী বাতি বসিয়ে তাকে দু-মুখ খোলা একটা কার্ডবোর্ডের চোঙ দিয়ে ঘিরে দিতে হবে। কার্ডবোর্ডের চোঙটার নীচের চারধারে কতকগুলি ছিদ্র করে দেওয়া দরকার। ক্ল্যাম্পের সাহায্যে পিতলের পাতখানার পিন-বসানো দিকটা সামনের দিকে প্রসারিত করে দাও। পিনটা যেন উপরের দিকে থাকে। কার্ডবোর্ডের চোঙ দিয়ে ঘেরা বাতিটাকে পাতখানার ঠিক নীচে বসিয়ে দাও। এবার পাখার ব্লেডের মত তৈরি টিনের চাকৃতিখানা পিনের মাথায় বসিয়ে সুইচ টিপে আলোটাকে জ্বেলে দেবার কিছুক্ষণ পরেই দেখতে পাবে, চাক্‌তিটা ঘুরতে আরম্ভ করেছে। বাতি ও চাকৃতিটাকে কি ভাবে বসাতে হবে—ছবি থেকেই সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারবে।

চাকৃতিখানার কিছু উপরে একখানা সাদা কাগজ ধরলে চলন্ত ছায়াগুলিকে মনে হবে যেন ধোঁয়া উঠছে।

উত্তাপ প্রতিফলনের পরীক্ষা

তোমরা সকলেই একথা জান যে, আয়না বা কোন মসৃণ পদার্থের উপর আলো ফেললে সেটা প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। কেবল আলোই নয়, উত্তাপের বেলায়ও ঠিক একই রকমের ব্যাপার ঘটে। প্যারাবোলিক মিররের সাহায্যে প্রতিফলিত উত্তাপ-তরঙ্গকে ঠিক আলোক-রশ্মির মতই সংহত অর্থাৎ কেন্দ্রীভূত করা যায়। এই বিষয়ে একটা পরীক্ষার কথা বলছি। চেষ্টা করলে তোমাদের অনেকেই সেটা করে দেখতে পারবে।

পরীক্ষার জন্যে মোটর গাড়ির হেড-লাইট, অর্থাৎ প্যারাবোলিক রিফ্লেক্টর, এক টুকরো অভ্রের পাত অথবা অ্যাস্‌বেস্টস সিট এবং খানিকটা নিক্রোম তার (ইলেকট্রিক হিটারের মধ্যে যে রকমের তার থাকে) যোগাড় করতে হবে। হেড-লাইটের মধ্যে যে বাল্‌ব



উত্তাপ প্রতিফলনের পরীক্ষা

থাকে, সে রকমের একটা অকেজো বাল্‌ব সংগ্রহ করে সেটাকে সাবধানে ভেঙে ফেল। পিতলের ক্যাপটার মধ্য দিয়ে যে ছুটো তার ভিতরে চলে গেছে সে তার ছুটো যেন নষ্ট না হয়। অবশ্য এই তার ছুটার সঙ্গে সংযুক্ত ফিলামেন্টের কুণ্ডলীটাকে ফেলে দিতে হবে

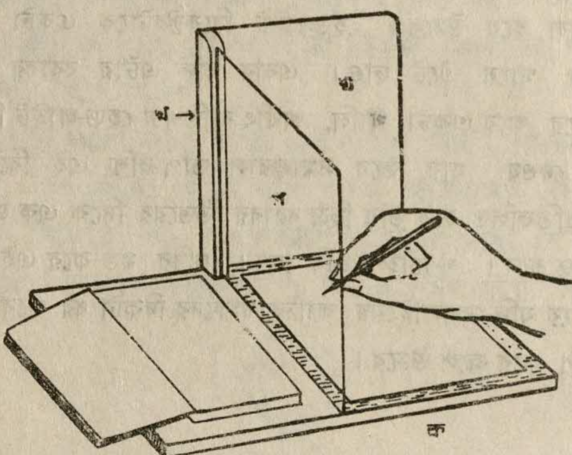
তারপর অভ্র বা অ্যাস্‌বেস্টসের পাতখানাকে কেটে ক-চিহ্নিত চিত্রের মত একটি ফর্মা তৈরি কর। প্রায় ১২ ইঞ্চি লম্বা ২৭ নম্বরের নিক্রোম তার ঐ ফর্মাটার গায়ে জড়িয়ে তারের ছু-প্রান্ত ক্যাপের মধ্যেকার তার ছুটোর সঙ্গে মোচড় দিয়ে জুড়ে দিতে হবে। তার জড়ানো ফ্রে্‌ম্‌টাকে প্লাস্টেসিনের সাহায্যে ক্যাপের মধ্যে বসিয়ে হেড-লাইট রিফ্লেক্টরের সকেটে লাগিয়ে দাও। এবার ১২ ভোল্টের একটা ব্যাটারীর সঙ্গে জুড়ে দিলেই নিক্রোম তারটা ক্রমশ উত্তপ্ত হতে হতে লাল হয়ে উঠবে। হেডলাইট রিফ্লেক্টরটাকে একটা কাঠের স্ট্যাণ্ডের গায়ে এঁটে দাও। এবার যদি এটার বরাবর ছু-তিন গজ দূরে আর একটা খালি, অর্থাৎ বাতিশূন্য হেড-লাইট রিফ্লেক্টর বসিয়ে দেওয়া যায়, তবে সমান্তরাল তাপ-রশ্মি এই রিফ্লেক্টরের মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে তার ছিদ্র বরাবর ভিতরের দিকে এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হবে। খ-চিহ্নিত ছবি দেখ। ছবির মত করে এই ছিদ্রের মধ্য দিয়ে যদি দেশলাইয়ের কাঠির বারুদের দিকটা ধর তবে দেখবে, সেটা দপ্‌ করে জ্বলে উঠবে।

গ্র্যাফোস্কোপ

ম্যাপ, ছবি বা নক্সা আঁকবার সময় তোমরা অনেকেই হয়তো খুব অসুবিধা ভোগ কর। অভ্যস্ত হলেও ভারতবর্ষ বা বাংলা দেশের একখানা ম্যাপ আঁকতে গলদঘর্ম হতে হয়; কাজেই কপি করা ছাড়া উপায় থাকে না। সাধারণ ছবির উপর পাত্‌লা কাগজ চেপে তার উপর পেন্সিল বুলিয়ে কপি করবার ব্যবস্থা তোমাদের জানা আছে—তাতে কিন্তু সব জিনিস পরিষ্কারভাবে দেখা যায় না। এসব জিনিস নিখুঁতভাবে কপি করবার সহজ ব্যবস্থা হয়তো তোমাদের অনেকেরই জানা নেই। খুব সহজে এসব জিনিস কপি করবার

একটা ব্যবস্থার কথা বলে দিচ্ছি। করে দেখো—কত সহজে অথচ সুন্দরভাবে কপি করা যায়। কপি করবার এই যন্ত্রটাকে বলা হয় গ্র্যাফোস্কোপ। নিজের হাতেই এরূপ একটা গ্র্যাফোস্কোপ তৈরি করে নিতে পার, মাত্র কয়েক টুকরো কাঠ আর একখানা চৌকা কাচ মাত্র দরকার হবে।

প্রায় ১৪ ইঞ্চি লম্বা ৯ ইঞ্চি চওড়া এবং আধ ইঞ্চি পুরু ক-চিহ্নিত একখানা তক্তার লম্বা দিকটার মাঝামাঝি এক ইঞ্চি চওড়া এবং দশ



গ্র্যাফোস্কোপ

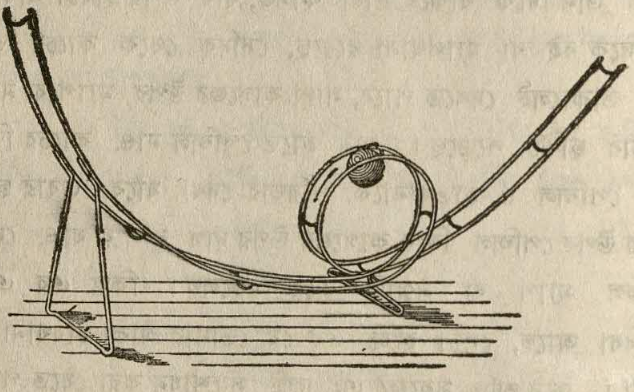
ইঞ্চি লম্বা খ-চিহ্নিত একখণ্ড কাঠ খাড়াভাবে বসিয়ে স্ক্রু দিয়ে এঁটে দাও। করাত দিয়ে এই খ-চিহ্নিত লম্বা কাঠখানার সামনের দিকে বরাবর খানিকটা চিরে দাও। এই চেরা জায়গাটার মধ্যেই (গ-চিহ্নিত) পরিষ্কার একখানা চৌকো কাচ ছবির মত করে বসিয়ে দিতে হবে। ঘ-চিহ্নিত তিন পিস্ কাঠের একখানা চৌকো বোর্ড ক-চিহ্নিত তক্তার ধারের গায়ে কাচখানার সমকোণে স্ক্রু দিয়ে এঁটে দাও। এবার ক-চিহ্নিত তক্তা এবং ঘ-চিহ্নিত বোর্ডের সামনের দিকটাতে ভুসা কালি বা অন্য কোন কালো রং মাখিয়ে নিলেই যন্ত্রটা তৈরি হলো। ছবিটা ভাল করে দেখে নাও, কি ভাবে যন্ত্রটা তৈরি করতে হবে, সেকথা বুঝতে কোন অসুবিধাই হবে না।

ম্যাপ অথবা যে বই থেকে কিছু কপি করতে চাও সেটাকে খাড়া কাচখানার বাঁদিকে রাখ। এর উপর বেশ আলো পড়া চাই। কাচের ডান দিকে থাকবে সাদা কাগজ, যার উপর ছবিটা আঁকবে। যে দিকে বই বা ম্যাপখানা রয়েছে, সেদিক থেকে কাচের ভিতর দিয়ে তাকালেই দেখতে পাবে, সাদা কাগজের উপর ম্যাপ বা নক্সার পরিষ্কার ছবিটি পড়েছে। ডান হাতে পেন্সিল নাও, কাচের ভিতর দিয়ে পেন্সিল ও হাতখানাকে পরিষ্কার দেখা যাবে। এবার ছায়া-রেখার উপর পেন্সিল দিয়ে কাগজের উপর দাগ বুলিয়ে যাও, দেখবে অবিকল ম্যাপ বা নক্সাটি এঁকে ফেলেছ। কিন্তু এর একটা অসুবিধা আছে, সেটা হচ্ছে এই যে, তোমার আঁকা ছবিখানা হবে উল্টো। তবে অতি সহজেই এই ত্রুটি সংশোধন করা যেতে পারে। কাগজখানার তলায় একখানা কার্বন পেপার চিৎ করে রেখে পেন্সিল বা অন্য কোন সূক্ষ্মমুখ শলাকা দিয়ে সাদা কাগজের উপর দাগ বুলিয়ে গেলেই কার্বন পেপারের দরুন কাগজের অপর পিঠে ঠিক ছবিটি অঙ্কিত হয়ে যাবে। কাগজখানাকে উল্টোলেই দেখবে, সোজা ছবিই হয়েছে।

বলের খেলা

তোমরা জান বোধ হয়, গতিশীল বস্তু সর্বদাই সোজা পথে চলতে চায়; কিন্তু কতকগুলি প্রতিকূল শক্তির জন্যে সোজা পথে চলতে পারে না। কাজেই কোন গতিশীল পদার্থকে বাঁকা পথে চালাতে হলে তার সোজা পথে চলবার ঝোঁকটাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার, যাতে ঘর্ষণজনিত শক্তিক্ষয় খুব কম হয় এবং সোজা পথে ছিট্‌কে বেরিয়ে যেতে না পারে, এই রকমের কোন ব্যবস্থা করতে পারলে কোন গতিশীল পদার্থ মাধ্যাকর্ষণের টান

উপেক্ষা করে খাড়াভাবে স্থাপিত বৃত্তাকার পথে ঘুরে আসবে। একটা খুব সহজ পরীক্ষার সাহায্যেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে।



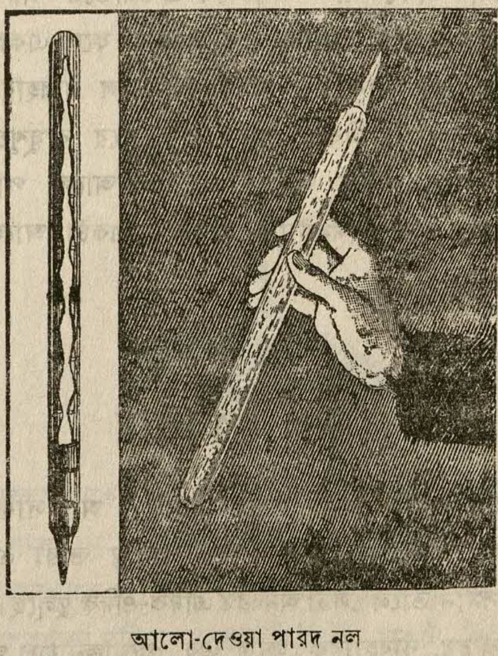
বলের খেলা

সমান মাপের লম্বা দু-গাছা সোজা তার সংগ্রহ কর। তার দু-গাছা পাশাপাশি প্রায় পৌনে এক ইঞ্চি তফাতে রেখে নীচের দিকে বাঁকানো ছোট ছোট তারের টুকরো কিছুটা দূরে দূরে রাং-ঝাল দিয়ে জুড়ে দাও। জিনিসটা হবে লম্বা একটা তারের মইয়ের মত দেখতে। এবার এই তারের মইটাকে বাঁকিয়ে একদিকে ফাঁসের মত করে ঘুরিয়ে আন। তারপর এই তারের মইটাকে উভয় প্রান্ত বাঁকিয়ে অর্ধচন্দ্রের মত করতে হবে। এই বক্রতা যতদূর সম্ভব মসৃণ হওয়া দরকার, অর্থাৎ আঁকাবাঁকা না হয়। এই অর্ধচন্দ্রাকৃতি তারের মই বা রেলটার নীচের দিকে দুটো তারের তৈরি পায়া রাং-ঝাল দিয়ে এমনভাবে জুড়ে দাও যেন আড়ভাবে বসিয়ে রাখা যায়। ছবিটা ভাল করে দেখে ঠিক ওইভাবেই তৈরি করবে। এবার এই অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি রেলটার লম্বা প্রান্তে বেশ একটি নিটোল বল ছেড়ে দিলেই দেখবে—বলটা গড়িয়ে ফাঁসের গোলাকার জায়গাটা ঘুরে অপর প্রান্তে চলে যাবে।

আলো বিকিরণকারী পারদ নল

ঘর্ষণের ফলে উৎপন্ন তড়িতের কতকগুলি পরীক্ষার কথা পূর্বে তোমাদের বলা হয়েছে। ঘর্ষণোদ্ভূত তড়িতের আর একটি অদ্ভুত পরীক্ষার কথা বলছি। পরীক্ষার জন্যে দরকার হবে খানিকটা পারা-ভর্তি বিশেষভাবে তৈরি একটা কাচের নল। এই কাচের নল গ্লাস-ব্লোয়ারকে দিয়ে তৈরি করে নিতে হবে। কিভাবে তৈরি করা দরকার, সে কথা বলছি।

ফুটখানেক লম্বা দুটো কাচের নল দরকার। একটা নল মোটা, অপরটা হবে তার চেয়ে সরু। সরু নলটাকে ব্লো করে ফুলিয়ে



আলো-দেওয়া পারদ নল

ফুলিয়ে মালার মত এক সার গুটি তুলে তার যে কোন প্রান্তের কাছাকাছি পাশের দিকে একটা ছিদ্র করে দিতে হবে। এবার গুটি—

তোলা সরু নলটাকে মোটা নলটার ভিতরে বসিয়ে ছিদ্র-করা দিকটা মোটা নলের যে কোন প্রান্তে জুড়ে দিতে হবে। গুটি-তোলা নলের অপর মুখটা থাকবে খোলা। এখন মোটা নলের এক ইঞ্চি, কি দেড় ইঞ্চি অবধি পারা ভর্তি করবার পর নলটাকে বায়ুশূন্য করে মুখ বন্ধ করে দিলেই হলো। ছবিটা ভাল করে দেখে নিয়ে গ্লাস-ব্লোয়ারকে দিয়ে যন্ত্রটা অনায়াসে তৈরি করিয়ে নিতে পারবে।

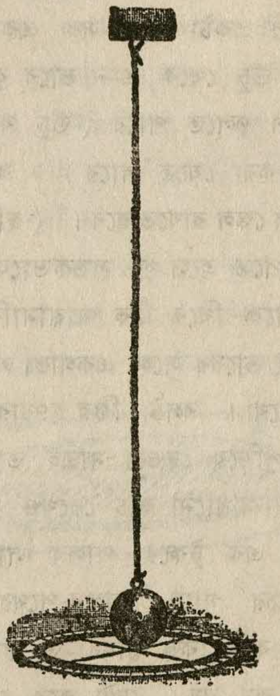
পারা-ভর্তি নলটাকে উল্টে দিলেই খানিকটা পারা গুটি-তোলা নলের ভিতর দিয়ে, আর খানিকটা তার বাইরের গা বেয়ে নীচের দিকে পড়বে। নলের ভিতর এরূপ ব্যবস্থা থাকায় পারাটা উপর থেকে নীচে পড়বার ফলে ধাক্কা লেগেও নলের নীচের দিকটা ভেঙে যাবার সম্ভাবনা থাকবে না। নলটাকে দ্রুতগতিতে বার বার উল্টে দিলে ভিতরকার পারাটা আন্দোলিত হওয়ার ফলে একরকম স্নিগ্ধ আলো নির্গত হতে থাকবে। অবশ্য দুটো নল ব্যবহার না করে একটা নলের মধ্যে খানিকটা পারা ভর্তি করে বায়ুশূন্য করলেও আলো দেখা যাবে; কিন্তু গুটি-তোলা নলে আলো পাওয়া যাবে বেশী। অন্ধকার ঘরে জিনিসটাকে চমৎকার একটা আলো দেওয়া রডের মত দেখাবে।

ফুকোস্ পেণ্ডুলাম

দেয়াল ঘড়ির পেণ্ডুলাম তোমরা সবাই দেখেছ। অতি সাধারণ একটা জিনিস। সরু একগাছা রডের নীচের প্রান্তে ভারী একটা ওজন ঝোলানো। সমান তালে সেটা অনবরত এদিক-ওদিক দুল্‌ছে। জিনিসটা তুচ্ছ হলে কি হয়, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা অসাধারণ! পিসা নগরীর গীর্জায় ঝোলানো একটা আলোকাধারের দোলন দেখে ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে গ্যালিলিও পেণ্ডুলামের দোলনের নিয়মাবলী আবিষ্কার

করেন। পেণ্ডুলামের বিভিন্ন ব্যবহারিক প্রয়োগের বিষয় আলোচনা না করে তোমাদের আজ একটা খুব সরল পরীক্ষার কথা বলছি।

পৃথিবী তার নিজের অক্ষরেখার উপর পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রচণ্ড বেগে ঘুরে চলেছে—একথা তোমরা সবাই জান। পৃথিবীর এই ঘূর্ণনের চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়ার জন্যে জাইরোস্কোপ ও অন্যান্য



ফুকোস্ পেণ্ডুলাম

পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু পৃথিবীর ঘূর্ণন পরীক্ষা করবার জন্যে প্যারিসের পার্থেননে পেণ্ডুলামের সাহায্যে ফুকো এক অদ্ভুত পরীক্ষা করেন। শয়ানভাবে স্থাপিত একটা স্কেলের উপর খুব উঁচু থেকে ঝোলানো পেণ্ডুলাম দুলিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি দেখলেন যে, তার দোলন একই তালে অব্যাহত আছে বটে, কিন্তু স্কেলটি সামান্য একটু ঘুরে গেছে। এ থেকেই পৃথিবীর ঘূর্ণনের প্রমাণ

পাওয়া যায়। পরীক্ষাটি যদি উত্তর আমেরিকার কোন জায়গায় করা যায় এবং পেণ্ডুলামটি ঠিক উত্তর-দক্ষিণে দুল্‌তে থাকে তবে দক্ষিণ দিক থেকে দেখা যাবে, উত্তরের প্রান্তটি অল্প সময়ের মধ্যেই ডানদিকে সরে যাচ্ছে।

পরীক্ষাটি আর একটু ছোট ভাবে সহজেই করা যেতে পারে। ছবির মত করে ভারী একটা বলকে সরু এক গাছা লম্বা তারে বেঁধে প্রায় ৫০।৬০ ফুট উঁচু থেকে এমন ভাবে ঝুলিয়ে দিতে হবে যেন বলটি উত্তর-দক্ষিণে দুল্‌তে পারে (উঁচু বাড়ির ছাদ থেকে বল ঝোলাবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে)। বলটির তলায় কাগজের একখানা গোলাকার স্কেল রাখতে হবে। (ছবি দেখো)। পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফল পেতে হলে খুব সতর্কভাবে পেণ্ডুলাম্‌টিকে দুলিয়ে দিতে হবে। বলটাকে ঘিরে ঠিক মাঝামাঝি সরু একগাছা তার বেঁধে দাও এবং সেই তারের সঙ্গে একগাছা সরু সুতা বেঁধে বলটাকে একদিকে টেনে রাখো। বলটা স্থির হওয়ার পর দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে সুতাটাকে পুড়িয়ে দেওয়া মাত্রই তার দোলন শুরু হবে। বলটার তলায় ভুসা-মাখানো কাচ রেখেও পরীক্ষা করতে পার। বলের নীচের দিকে এক টুকরো পালক লাগিয়ে দাও। পালকটা ভুসা-মাখানো কাচের গায়ে দোলন-পথের দাগ কেটে যাবে। পরীক্ষাটা খুব সহজ বটে, কিন্তু সুবিধামত স্থান নির্বাচন এবং অন্যান্য ব্যবস্থাদির ঝঞ্ঝাট কম নয়। চেষ্টা করে দেখো, যদি কেউ করে দেখতে পার তবে পৃথিবীর ঘূর্ণন সম্বন্ধে অনেকটা পরিষ্কার ধারণা হবে।

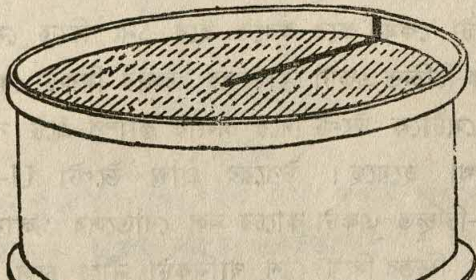
পৃথিবীর ঘূর্ণনের পরীক্ষা

ফুকোস্‌ পেণ্ডুলামের পরীক্ষায় পৃথিবীর ঘূর্ণনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় বটে; কিন্তু তোমাদের কাছে অনেকটা পরিবর্তিত আকারে

সেই রকমের আর একটা সহজ পরীক্ষার কথা বলছি, যাতে পৃথিবীর ঘূর্ণনের একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাবে।

প্রায় ৪ ইঞ্চি খাড়াই ও আড়াই ইঞ্চি ব্যাসার্ধের একটা পাত্রের কানা থেকে আধ ইঞ্চি নীচু অবধি জল ভর্তি কর। কোন রকম কম্পন না থাকে বা বাতাস না লাগে, এমন কোন জায়গায় জলভর্তি পাত্রটাকে বসিয়ে দাও। সামান্য লাইকোপোডিয়ামের গুঁড়োর দরকার হবে। ওষুধের দোকানে সামান্য ব্যয়েই জিনিসটা কিনতে পাওয়া যাবে। পাত্রটার জলের উপর সামান্য কিছু লাইকোপোডিয়ামের গুঁড়ো ছড়িয়ে দাও। গুঁড়োগুলি ছড়িয়ে গিয়ে জলের উপর খুব পাতলা আস্তরণ সৃষ্টি করবে।

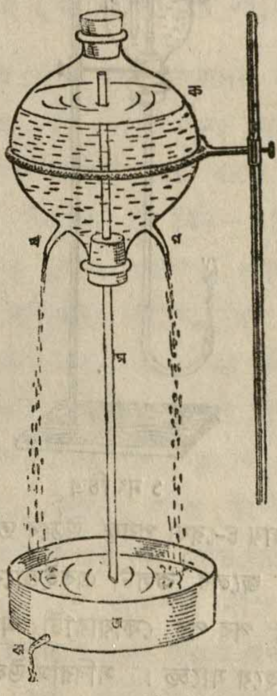
এবার উপর থেকে খুব আল্‌তোভাবে ভুসা-কালি ছড়িয়ে জলের উপরকার আস্তরণটার মধ্যস্থল থেকে পাত্রটার ধার পর্যন্ত বেশ মোটা একটা লাইন তৈরি কর। লাইনটা যেখানে গিয়ে পাত্রটার



জলপূর্ণ পাত্রের উপারভাগে লাইকোপডিয়ামর
গুঁড়ো ছড়িয়ে তার উপরে ভুসা-কালির
লাইন তৈরি করা হয়েছে

গায়ে ঠেকবে সেখানে কানাটার গায়ে উপর দিকে কালো কালির একটা দাগ কেটে দাও। কি রকম করতে হবে ছবিটা দেখে ঠিক করে নাও।

চিহ্নিত দু-মুখ খোলা একটা গোলাকার কাচের পাত্র স্ট্যাণ্ডের উপর বসানো আছে। পাত্রটার দু-দিকে আছে খ ও গ-চিহ্নিত দুটি নল। এই নলের ভিতর দিয়ে জল বেরিয়ে যেতে পারে। পাত্রটার নীচের মুখ ছিদ্র-করা একটা কর্ক দিয়ে আঁটা আছে। ওই ছিদ্রের ভিতর দিয়ে লম্বা একটা কাচের নল ছবির মত করে বসিয়ে দিতে হবে। নলের তলায় জ-চিহ্নিত পাত্রের জল বেরিয়ে যাবার পথসমেত একটা চওড়া পাত্র বসিয়ে দাও। পাত্রটাকে এমনভাবে জল ভর্তি কর যেন ঘ-নলের



২ নং চিত্র

মুখে না লেগে যায়—একটু ফাঁক থাকে। এবার ক-চিহ্নিত পাত্রের মধ্যে নলের মুখের খানিকটা নীচু অবধি জল ভর্তি করে মুখটাতে ছিপি এঁটে দাও। খ ও গ-চিহ্নিত নল দিয়ে জ-চিহ্নিত পাত্রের মধ্যে জল পড়তে থাকবে। জ-চিহ্নিত পাত্রের জল বৃদ্ধি পেলেই নলের মুখটা

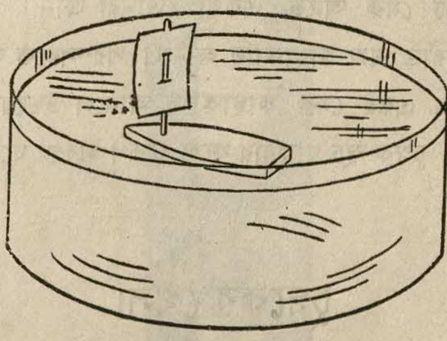
বন্ধ হয়ে যাবে, আর সঙ্গে সঙ্গে খ, গ জলের ধারাও বন্ধ হয়ে যাবে। ঝ-নলের ভিতর দিয়ে জল বেরিয়ে যাবার ফলে কিছুক্ষণ বাদেই আবার ঘ-নলের মুখ থেকে জল নীচে নেমে যাবে। এর ফলে আবার খ গ নল দিয়ে জল পড়া শুরু হবে। ক-চিহ্নিত পাত্রে যতক্ষণ জল থাকবে ততক্ষণই ঠিক নির্দিষ্ট সময় পর পর খ ও গ নল দিয়ে জলের ধারা পড়তে থাকবে।

চুম্বকের খেলা

ইতিপূর্বে তোমাদের কয়েক রকমের চুম্বকের খেলার কথা বলা হয়েছে। এবার আর একটা খুব সহজ খেলার কথা বলছি। এটা তোমরা সবাই করে দেখতে পারবে।

সোলা দিয়ে ছোট্ট নৌকা বা ভেলার মত জিনিস তৈরি করো। নৌকা বা ভেলার পরিবর্তে সোলার ছোট্ট হাঁসও তৈরী করতে পারো।

মাঝারি গোছের গোটা তিনেক সূচ নিয়ে সেগুলিকে একমুখী করে ধরো এবং তার উপরে একটা বার-ম্যাগ্‌নেটের একদিকের মুখ ডান



চুম্বক-সূচ বেঁধানো সোলার নৌকা জলের উপর ভাসছে

থেকে বাঁ-দিকে আল্‌তোভাবে বার কয়েক ঘষ্‌ড়ে নাও। ডান থেকে বাঁয়ে অথবা বাঁ থেকে ডানে, যে-কোন একদিকেই কেবল ঘষ্‌ড়াতে

হবে ; একবার এদিকে, আবার ওদিকে ঘষ্‌ড়াবে না। দেখবে স্থচ-গুলি চুম্বকের গুণ পেয়েছে।

এবার একটা চুম্বক-স্থচ সোলার নৌকা অথবা হাঁসটার ভিতর চেপে ঢুকিয়ে দাও। ফুটখানেক লম্বা সরু একখণ্ড নরম কাঠের লাঠি জোগাড় কর। লাঠিটার ছু-মুখে অপর ছুটো স্থচ চেপে ঢুকিয়ে দিতে হবে। লাঠির এক প্রান্তে স্থচের ডগাটা থাকবে বাইরের দিকে, অপর প্রান্তের স্থচের ডগাটা থাকবে লাঠির ভিতরের দিকে।

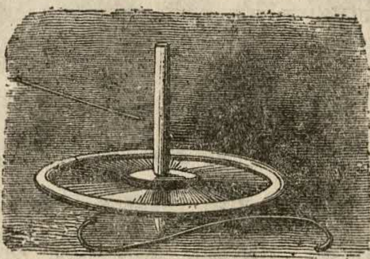
একটা বড় পাত্রে জল ভর্তি করে তাতে নৌকা অথবা হাঁসটা ভাসিয়ে দাও। বন্ধুবান্ধবদের বলবে—দেখো, নৌকাটা জলের উপর এক জায়গায় ভেসে আছে—কোন দিকেই যাচ্ছে না। কিন্তু এটা আমার আদেশ বুঝতে পারে—আমি যেদিকে যেতে বলব, ঠিক সেদিকেই যাবে। লাঠিটার একমুখ নৌকাটার কাছাকাছি নিয়ে বলবে—এদিকে এসো। নৌকাটা অমনি তোমার নির্দেশমত সেদিকেই এগিয়ে আসবে। লাঠিটার মুখ ঘুরিয়ে যদি নৌকাটাকে আবার পিছু হট্‌তে আদেশ দাও তবে সেটা পিছন দিকেই চলতে থাকবে।

কেন এমন হয়, সহজেই বুঝতে পারো। প্রত্যেক চুম্বকেরই উত্তর ও দক্ষিণ ছুটি মেরু আছে, একথা তোমরা জান। উভয় চুম্বকের পরস্পর বিপরীত মেরু কাছাকাছি আনলে পরস্পরকে আকর্ষণ করে ; কিন্তু উভয়ের একই মেরু কাছাকাছি আনলে উভয়ে উভয়কে দূরে ঠেলে দেয়। চুম্বক-স্থচ থাকবার ফলে এরূপ অবস্থা ঘটে থাকে।

চুম্বকের খেলা

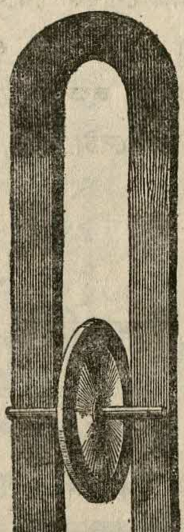
চুম্বক-লাট্টু তোমরা দেখেছ নিশ্চয়ই। এই লাট্টুর অক্ষদণ্ডটা (অর্থাৎ যেটার উপর লাট্টুটা ঘোরে) থাকে চুম্বক-লোহার। লাট্টুটা ঘুরিয়ে তার আলের কাছে সরু এক টুকরো বাঁকানো বা সোজা লোহার তার

ছেড়ে দিলে দেখা যাবে—তারটা একবার এদিক আবার ওদিক—অনবরত যাতায়াত করছে। অবশ্য লাটুটা যতক্ষণ ঘুরবে ততক্ষণই কেবল এ রকমের ব্যাপার দেখা যাবে। চুম্বক-শলাকা দিয়ে যে-কোন



চুম্বক লাট্টু

রকমে এই রকমের লাট্টু তোমরা অনায়াসেই তৈরি করতে পারো। কিন্তু আজ তোমাদিগকে এই ধরনের আর একটা চুম্বকের খেলার



U-চুম্বকের উপর দিয়ে চাকাটা গড়িয়ে যাচ্ছে

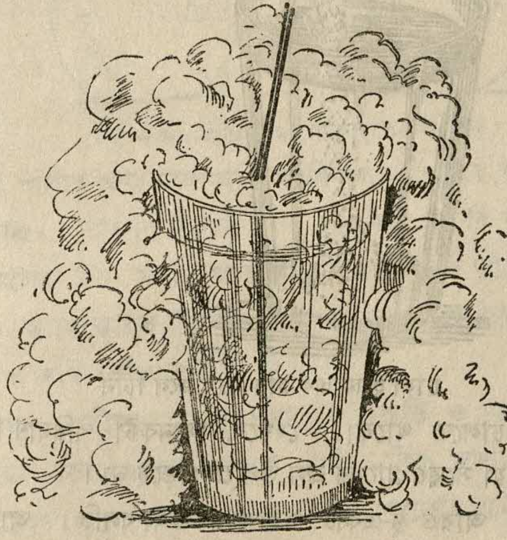
কথা বলছি। এই খেলাটাও বেশ কৌতুকজনক। সহজেই এটা তোমরা করে দেখতে পারো।

এর জন্যে প্রথমে লম্বাটে ধরনের একটা U-অক্ষরের মত বাঁকানো চুম্বক জোগাড় করা দরকার। তারপর একটু পুরু সীসা বা পিতলের পাত থেকে টাকার আকারে একখানা গোল চাক্‌তি কেটে নাও। চাক্‌তিটার ঠিক মাঝখানে সরু একটা ছিদ্র করে মাপমত সরু এক টুকরো লোহার তার এফোঁড়-ওফোঁড় করে এঁটে বসিয়ে দাও। জিনিসটা চ্যাপ্টা একটা লাট্টুর মত হবে। হাত দিয়ে লাট্টুর মত ঘুরিয়ে দেখো, ঘোরবার সময় যেন টাল না খায়। এবার চাকাটাকে ছবির মত করে খাড়াভাবে রাখা U-চুম্বকখানার উপরে ছেড়ে দাও। দেখবে, চাকাটা চুম্বকের বাহু দুটির উপর দিয়ে প্রান্তভাগের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু চাকাটা চুম্বকের প্রান্তভাগে এসেই থেমে যাবে না, গড়িয়ে চুম্বকটার উল্টো পিঠে, অর্থাৎ পিছন দিক দিয়ে অনেকটা উপরে উঠে যাবে। আবার সেদিক থেকে গড়িয়ে সামনের দিকে আসবে। এরূপ কিছুক্ষণ এধার-ওধার ওঠা-নামার পর অবশেষে প্রান্তভাগে এসে থেমে থাকবে। লক্ষ্য রাখবে, চাকাটা যেন অতিরিক্ত ভারী না হয়—চুম্বকের টানে সেটা যেন তার গায়ে লেগে থাকতে পারে।

কয়েকটি রাসায়নিক পরীক্ষা

পদার্থের বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে দুটি ধর্ম হচ্ছে—বিস্তৃতি আর অভেদ্যতা। পদার্থমাত্রেই কিছু-না-কিছু স্থান অধিকার করে থাকে—যাকে বলা হয় বিস্তৃতি এবং দুটি পদার্থ একই সময়ে একই স্থান অধিকার করে থাকতে পারে না—একে বলা হয়েছে অভেদ্যতা। এগুলি যে অতি সাধারণ জ্ঞানের কথা তা তোমরা সহজেই বুঝতে পারো। ধর, একটা কাচের গ্লাসের গায়ে কাগজের সরু ফালি এঁটে দুধ বা জলের আয়তন অনুযায়ী আধ-পো, এক-পো ইত্যাদি দাগ কাটা আছে। প্রথমে

গ্লাসের মধ্যে আধ-পো দাগ পর্যন্ত দুধ ঢালো। তারপর তাতে আবার সমপরিমাণ জল ঢেলে দিলে কি হবে? জল ও দুধ মিশ্রিত সেই তরল পদার্থের আয়তন গ্লাসের এক-পো দাগ অবধি বেড়ে যাবে—একথা সবাই বুঝতে পারো। কিন্তু এমন কতকগুলি জিনিস নিয়ে এই রকমের পরীক্ষা করা যায়—যাতে সম আয়তনের দুটি বিভিন্ন তরল পদার্থ একসঙ্গে মিশিয়ে দিলেও কোন কোন ক্ষেত্রে আয়তন বৃদ্ধি পায় না মোটেই—সমানই থেকে যায়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অনুরূপ পরীক্ষায় আয়তন বৃদ্ধি পাওয়া তো দূরের কথা বরং মিশ্রণের ফলে আয়তন কমে যায়।

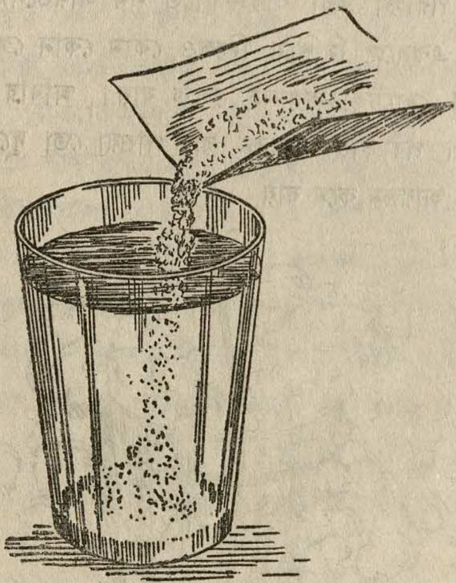


এক গ্লাস অ্যালকোহলের মধ্যে তূলা ভর্তি করা হচ্ছে

অ্যালকোহল দিয়ে একটা গ্লাস ভর্তি করো। তারপর একটা কাঠি দিয়ে খুব ধীরে ধীরে সেই অ্যালকোহলের মধ্যে আ-পেঁজা তূলা ডুবাতে থাকো। খুব সন্তর্পণে আস্তে আস্তে ডুবাতে পারলে মাঝারি গোছের একঝুড়ি তূলা গ্লাসের মধ্যে অনায়াসে ডুবে যাবে, অথচ গ্লাসের অ্যালকোহল এক ফোঁটাও উপ্‌চে পড়বে না। ধীরে ধীরে ডুবানোর

ফলে অ্যালকোহল তূলার তন্তুর মধ্যে ঢুকে যায়। এতে গ্লাসের অ্যালকোহলের আয়তন সামান্য কিছু বৃদ্ধি পেলেও তা এতই কম যে, চোখে দেখে কিছুই বোঝা যায় না।

অন্যভাবেও আর একটা পরীক্ষা করে দেখতে পারো। কানায় কানায় গরম জল ভর্তি একটা গ্লাসের মধ্যে অল্প অল্প করে ধীরে ধীরে

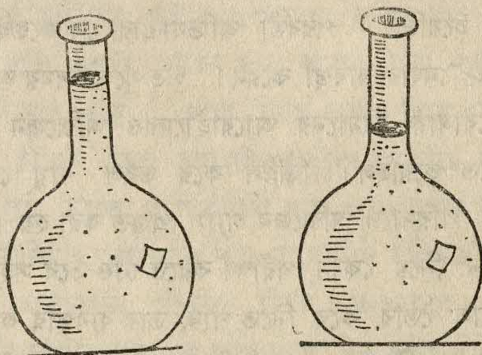


ঢালা হচ্ছে এক গ্লাস গরম জলে চিনি

মিহি চিনি ঢালতে থাকো। দেখবে, অনেকটা পরিমাণ চিনি জলে মিশ্রিত হওয়া সত্ত্বেও গ্লাসের জল উপ্‌চে পড়ছে না।

এ ছাড়া আরও ছু-একটি পরীক্ষার কথা বলছি। অ্যালকোহল এবং জল অথবা জল এবং সালফিউরিক অ্যাসিডের মিশ্রণে আরও অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যাবে। অ্যালকোহল এবং জলের কথাই ধরা যাক। সমান আয়তনের জল এবং অ্যালকোহল যদি একত্রে মিশ্রিত করা যায় তবে দেখা যাবে, আলাদা আলাদা ভাবে এই তরল পদার্থ ছুটির যতটা স্থান অধিকার করবার কথা—মিশ্রিত অবস্থায় তার চেয়ে অনেকটা কম স্থান অধিকার করবে। অর্থাৎ পৃথকভাবে এই

তুটি পদার্থের আয়তনের যোগফল যদি হয় ১০০, তবে মিশ্রিত অবস্থায় এর আয়তন হবে মাত্র ৯৪। সালফিউরিক অ্যাসিড ও জলের মিশ্রণের বেলায় আয়তন আরও কমে যাবে। খুব সহজেই পরীক্ষাটা করে দেখতে পারো। সরু গলার তুটো কাচের ফ্লাস্ক জোগাড় করে



জল ও জলমিশ্রিত অ্যালকোহলের পরীক্ষা

একটার গলার প্রায় মাঝামাঝি অবধি জল ভর্তি করে সুতা বেঁধে চিহ্ন করে নাও। তারপর ঠিকমত মাপ করে তার অর্ধেক জল ঢেলে নিয়ে সেই জলের ঠিক সমান আয়তনের অ্যালকোহল তাতে ঢেলে দাও। জল ও অ্যালকোহল মিশ্রিত হয়ে যাবার পর দেখবে, মিশ্রণটি সেই সূতাবাঁধা দাগ পর্যন্ত পৌঁছায় নি।

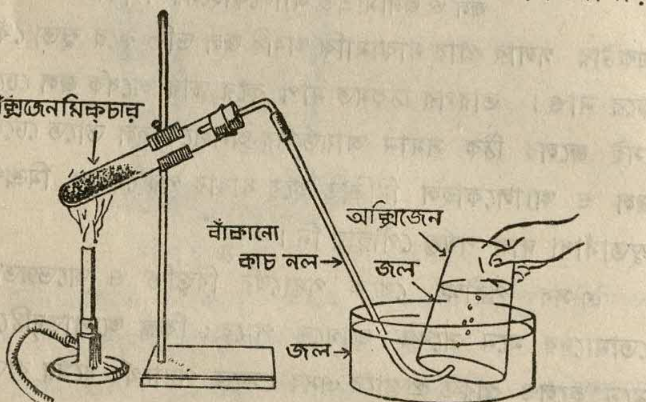
এ-সব পরীক্ষা থেকে পদার্থের বিস্তৃতি ও অভেদ্যতা সম্বন্ধে তোমাদের মনে সন্দেহ জাগতে পারে; কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এরূপ মনে হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে এসব ক্ষেত্রে পদার্থের ধর্মের ব্যত্যয় ঘটে না। তবে কেন এমন হয় তা পরে বুঝতে পারবে।

অক্সিজেন প্রস্তুত প্রণালী

অক্সিজেন গ্যাসের কথা তোমাদের অজানা নয়। এর বহুবিধ ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার কথা না জানলেও একটা কথা বোধ হয়

সবাই জান যে, অক্সিজেন ছাড়া আমরা শ্বাসক্রিয়া চালাতে পারি না। যতই ঊর্ধ্বে ওঠা যায়, বাতাস ততই বিরল হতে থাকে; কাজেই অক্সিজেনও কম পড়ে। এজন্যেই প্রথম এভারেস্ট অভিযাত্রীদের ২৭,০০০ ফিট উপরে ওঠবার পর এক পা চলতে প্রায় ৭।৮ বার শ্বাস-গ্রহণ করতে হয়েছিল। পরবর্তী অভিযাত্রীরা সে জন্যেই অক্সিজেন সিলিণ্ডার সঙ্গে নেবার ব্যবস্থা করেন। গত যুদ্ধের সময় অতি ঊর্ধ্বে বিচরণকারী বোমারু বিমানের আরোহীদেরও অক্সিজেন সিলিণ্ডার ব্যবহার করতে হয়েছিল। ডিস্টিল করে তরল বায়ু থেকে অল্প খরচায় প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন গ্যাস প্রস্তুত করা হয়। তোমরা যদি অক্সিজেন নিয়ে কোন পরীক্ষা করতে চাও তবে সহজেই যাতে অক্সিজেন গ্যাস তৈরি করে নিতে পার, তার ব্যবস্থার কথা বলছি।

ব্যবস্থাটা খুব জটিল নয়, সহজেই প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি জোগাড়



অক্সিজেন প্রস্তুত প্রণালী

করতে পারবে; তবে কোন ল্যাবরেটরিতে করতে পারলেই সবচেয়ে সুবিধা হবে। যা হোক, প্রথমে একটা শক্ত কাচের টেস্ট টিউব জোগাড় করতে হবে। টেস্ট টিউবের মুখে বেশ এঁটে বসতে পারে, এই রকমের একটা কর্কের ছিপি এফোঁড়-ওফোঁড় ছিদ্র করে তার মধ্যে ছবির মত দু-মুখ বাঁকানো লম্বা একটা কাচের নলের একটা মুখ ঢুকিয়ে

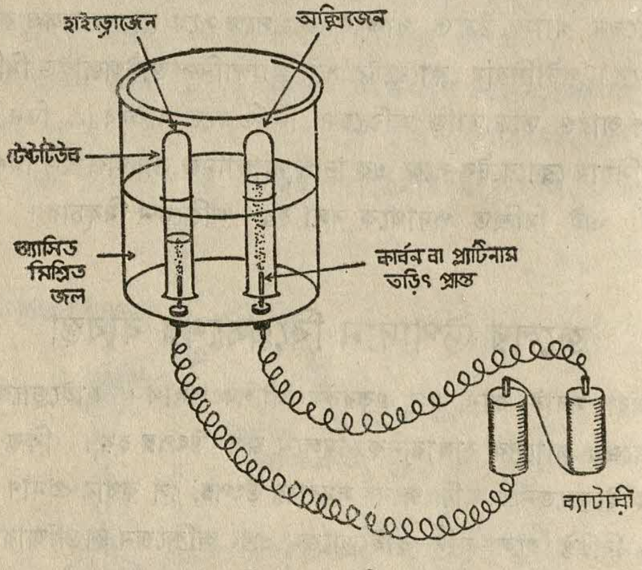
দিতে হবে। এবার টেস্ট টিউবটার মধ্যে খানিকটা পটাসিয়াম ক্লোরেট রেখে নল সমেত কর্কটাকে টিউবের মুখে এঁটে দাও। মুখটা উপরের দিকে রেখে কাৎভাবে টেস্ট টিউবটাকে স্ট্যাণ্ডের সঙ্গে আট্‌কে দিতে হবে। কানাউঁচু একটা পাত্রে জল ভর্তি কর। টেস্ট টিউবের বাঁকানো নলটার অপর মুখটাকে সেই জলের মধ্যে ডুবিয়ে দাও। কানায়-কানায় জল-ভর্তি একটা কাচের গ্লাস জলে-ডুবানো নলটার মুখের উপর উপুড় করে ধরো। এবার গ্যাস বার্নার দিয়ে টেস্ট টিউবের পটাসিয়াম ক্লোরেট উত্তপ্ত করলেই বুদবুদের আকারে গ্লাসের মধ্যে অক্সিজেন গ্যাস উঠতে থাকবে এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্লাসের জলও কমতে থাকবে। পটাসিয়াম ক্লোরেটের সঙ্গে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড মিশিয়ে নিলে আরও তাড়াতাড়ি অক্সিজেন নির্গত হতে থাকবে। তিন ভাগ পটাসিয়াম ক্লোরেটের সঙ্গে এক ভাগ ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড মিশাতে হবে। এই মিশ্রিত পদার্থকে বলা হয়—অক্সিজেন মিক্‌চার।

জলের উপাদান বিশ্লেষণের ব্যবস্থা

তোমরা সবাই জান, জল একরকম যৌগিক পদার্থ। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসের রাসায়নিক মিলনে জল উৎপন্ন হয়। কিন্তু জল যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সমবায়ে উৎপন্ন, সে কথার প্রমাণ কি? জল বিশ্লিষ্ট হলে যদি হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন ছাড়া আর কিছু না পাওয়া যায়, তবেই এ-কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। ইচ্ছা করলে তোমাদের মধ্যে অনেকেই সহজে একটা পরীক্ষা করতে পারো। এই পরীক্ষার সাহায্যেই দেখতে পাবে—জল বিশ্লিষ্ট হয়ে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন গ্যাসে পরিণত হয়। কিভাবে পরীক্ষাটা করতে হবে, তার ব্যবস্থার কথা বলছি।

বাজারে আজকাল সাদা প্লাস্টিকের নানারকম পাত্র কিনতে পাওয়া যায়। ওই রকম সাদা প্লাস্টিকের গ্লাসের মত একটা মাত্র (পাত্রটি

ছবির মত হলেই ভাল হয়) সংগ্রহ করো। পাত্রের তলায় ছুটো মোটা ছিদ্র করতে হবে। ছিদ্র ছুটোর ভিতর দিয়ে ছু-টুকরো মোম ছিপির মত করে বসিয়ে দাও। এবার টর্চের পুরনো ব্যাটারী ভেঙে ভিতর থেকে ছুটো কার্বন-পেন্সিল সংগ্রহ করো। পেন্সিল ছুটোকে মোমের ছিপির মধ্যে দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় ঢুকিয়ে দাও। খানিকটা গরম একটা লোহার তার দিয়ে মোমটাকে নরম করে পেন্সিলের গায়ে এবং পাত্রের ছিদ্রের মধ্যে বেশ এঁটে বসিয়ে দিতে হবে। এবার গ্লাসটাতে আধাআধি জল ভর্তি করো। ছুটো টেস্ট টিউব জোগাড় করতে হবে।



জল বিশ্লেষণের পরীক্ষা

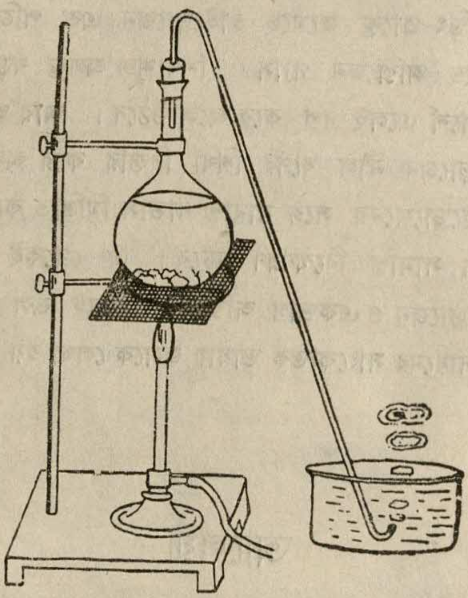
টেস্ট টিউব ছুটোতেই সম্পূর্ণরূপে জল ভর্তি করে হাতের বুড়ো আঙুলে মুখ টিপে উপুড় করে গ্লাসের জলের মধ্যে কার্বন-পেন্সিল ছুটোর উপর বসিয়ে দাও। এবার টর্চ লাইটের ছুটো ব্যাটারী সংগ্রহ করে তার সঙ্গে ছবির মত ব্যবস্থায় কার্বন-পেন্সিল ছুটো যোগ করে দিলেই দেখবে—জলের মধ্যে ছুটো কার্বন-পেন্সিল থেকেই গ্যাসের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বুদ্‌বুদ্ উঠে টেস্ট টিউবের উপরে জমা হচ্ছে। আরও লক্ষ্য

করে দেখো—নেগেটিভ তড়িৎ-প্রান্ত থেকে যে গ্যাস উঠছে সেটা পজিটিভ তড়িৎ-প্রান্ত থেকে উদ্ভূত গ্যাসের দ্বিগুণ। জলের মধ্যে দু-এক ফোঁটা অ্যাসিড অথবা সামান্য একটু নুন মিশিয়ে দিলে খুব সন্তোষজনক ফল পাওয়া যাবে। পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারবে—নেগেটিভ তড়িৎ-প্রান্তে জমেছে হাইড্রোজেন এবং পজিটিভ তড়িৎ-প্রান্তে জমেছে অক্সিজেন গ্যাস। শিখাশূন্য জ্বলন্ত খড়কুড়া অক্সিজেনের সংস্পর্শে এলেই দপ্ করে জ্বলে উঠবে। আর আগুন ধরিয়ে দিলে হাইড্রোজেন নীল বর্ণের শিখা বিস্তার করে জ্বলতে থাকে। তাছাড়া হাইড্রোজেনের সঙ্গে সামান্য বাতাস মিশ্রিত করে প্রজ্জ্বলিত করবার সময় সামান্য বিস্ফোরণ ঘটবে। এ থেকেই বুঝা যায়, দু-ভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেন মিলেই জল উৎপন্ন হয়। এইজন্যেই রসায়নের সাংকেতিক ভাষায় জলকে লেখা হয় H_2O।

আলেয়া

তোমরা অনেকেই হয়তো আলেয়ার কথা শুনে থাকবে। রাত্রিবেলায় জনমানব-শূন্য উন্মুক্ত প্রান্তরে অনেক সময় দেখা যায়—মাটি থেকে কয়েক হাত উঁচুতে একটা জ্বলন্ত আগুনের গোলা কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করে হঠাৎ যেন দপ্ করে নিবে গেল। প্রবল বৃষ্টি-ধারার মধ্যেও আগুনটাকে দাউ দাউ করে জ্বলতে দেখা যায়। এই জিনিসটাকেই বলা হয় আলেয়া বা ভৌতিক আলো। আলেয়ার রহস্য সঠিক জানা না থাকলেও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় হাওয়ায় ভেসে-বেড়ানো এক রকমের জ্বলন্ত অগ্নিগোলক সহজেই উৎপাদন করা যেতে পারে। তোমরা কেউ যদি আলেয়া প্রত্যক্ষ করতে চাও, তবে নিম্নোক্ত পরীক্ষাটি করে দেখতে পারো।

পরীক্ষাটা করতে হলে খানিকটা কষ্টিক পটাস, কিছুটা ফস্‌ফোরাস, একটা কাচের ফ্লাস্ক, কর্ক ও লম্বা একটা কাচের নল জোগাড় করতে হবে। এসব জিনিস যে-কোন কেমিস্টের দোকানে কিনতে পাওয়া যাবে।



ফস্‌ফোরেটেড হাইড্রোজেন বা আলেয়া উৎপাদন প্রণালী

প্রথমে কষ্টিক পটাস জলে গুলে উগ্র সলিউসন তৈরী করে নিতে হবে। ফ্লাস্কের প্রায় অর্ধেকটা কষ্টিক পটাস সলিউসনে ভর্তি করো এবং তার মধ্যে কয়েক টুকরো ফস্‌ফোরাস ফেলে দাও। কোল-গ্যাস অথবা হাইড্রোজেন দিয়ে ফ্লাস্কের উপরের অংশটার বাতাস তাড়িয়ে দিতে হবে। কাচের নলটা যাতে আঁটভাবে ঢুকতে পারে, কর্কের মধ্যে সেরকমের এফোঁড়-ওফোঁড় ছিদ্র কর। গ্যাসের বাতির উপর গরম করে কাচের নলটাকে ছবিতে দেখানো নক্সা অনুযায়ী বাঁকিয়ে নাও এবং বাঁকানো নলের সোজা দিকটা কর্কের মধ্যে ঢুকিয়ে কর্কটাকে ফ্লাস্কের মুখে এঁটে দাও। ফ্লাস্কটাকে স্ট্যাণ্ডের উপর বসিয়ে নলের

অপর প্রান্ত জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখো। ছবিটা দেখে নাও। এবার গ্যাসের বাতির অল্প আঁচে ফ্লাস্কটাকে মিনিট কয়েক গরম করলেই দেখবে, জলের মধ্যে এক রকম গ্যাসের বুদ্‌বুদ উঠতে শুরু করেছে। জল থেকে বেরিয়ে এসেই গ্যাসটা কুণ্ডলীর আকারে হাওয়ায় ভেসে যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই জ্বলে উঠবে। এই গ্যাসটাকে বলা হয়—ফস্‌ফেন বা ফস্‌ফোরেটেড হাইড্রোজেন।

কস্টিক পটাস ও ফস্‌ফোরাস বিপজ্জনক পদার্থ, খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হবে। ফস্‌ফোরাস বাতাসের সংস্পর্শে এলেই ধোঁয়া বেরুতে থাকে এবং জ্বলে ওঠে; কাজেই ফস্‌ফোরাস সর্বদাই জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে হয়।

ইলেকট্রোফোরাস

ইতিপূর্বে তোমাদের কিছু কিছু বৈদ্যুতিক পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে। এবার এমন একটা বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্রের কথা বলছি, যা সহজেই তোমরা তৈরি করতে পারবে। যন্ত্রটার নাম হচ্ছে ইলেকট্রোফোরাস। স্থির বিদ্যুৎ (Static electricity) উৎপাদনের জন্যে ১৭৫৫ খৃস্টাব্দে ভল্টা এই যন্ত্র উদ্ভাবন করেন।

ইলেকট্রোফোরাস তৈরি করতে হলে দুটি জিনিসের দরকার—রজন জাতীয় পদার্থের একটা পুরু চাক্‌তি, আর তড়িৎ-অপরিচালক কোন পদার্থের হাতলওয়ালা একখানা গোলাকার টিনের পাত। নীচু কানওয়ালা চওড়া একটা পাত্রের মধ্যে কিছু রজন (সিলিং ওয়াক্স হলেও চলবে) আগুনে গলিয়ে নাও। লক্ষ্য রাখবে, যেন বেশী গরম না হয়ে যায়; কারণ—তাহলে রজনে আগুন ধরে যেতে পারে। প্রথম দেওয়া রজন গলে গেলে তাতে টুকরো টুকরো করে আরও রজন দাও, যাতে পাত্রটা প্রায় কানায় কানায় ভর্তি হতে পারে। সবটা

গলে গেলে পাত্রটাকে আগুনের উপর থেকে নামিয়ে ঠাণ্ডা হতে দাও। পাত্রের মধ্যে রজন সমতল ভাবে জমে যাবে। এবার রজন জমানো গোলাকার পাত্রটার চেয়ে বেশ খানিকটা ছোট করে পাতলা একখানা টিনের চাক্‌তি কেটে নাও। তামা, দস্তা প্রভৃতির পাতলা

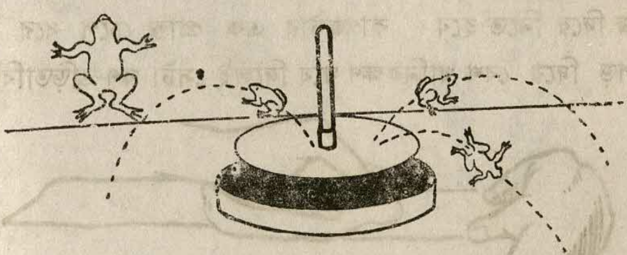


ইলেকট্রোফোরাস

চাক্‌তি হলেও চলবে। এবার টিনের চাক্‌তিটার ঠিক মধ্যস্থলে ছবির মত করে ছোট্ট একটা টিনের চোঙ্‌ রাং-ঝাল দিয়ে এঁটে দাও। এই চোঙ্‌টার মধ্যে ৪।৫ ইঞ্চি লম্বা, মোটা একটা কাচের নল বসিয়ে সিলিং ওয়াক্স দিয়ে জুড়ে দিলেই তড়িৎ-অপরিচালক হাতলের কাজ হবে।

কি ভাবে ইলেকট্রোফোরাস ব্যবহার করতে হবে, এবার সে কথাই বলছি। শুক্‌নো এক টুকরো ফ্ল্যানেল বা পশমী কাপড় দিয়ে রজনের চাক্‌তিটাকে বারবার আঘাত করো, অথবা দ্রুতগতিতে কিছুক্ষণ ঘষে দাও। তারপর ডানহাতে কাচের হাতলটা ধরে টিনের চাক্‌তিখানা রজনের উপর রেখে বাঁ-হাতের আঙ্‌ুল দিয়ে মুহূর্তের জন্যে টিনের চাক্‌তিটাকে স্পর্শ করো। আঙ্‌ুল সরিয়ে নেবার পর কাচের হাতল ধরে টিনের চাক্‌তিটাকে রজনের উপর থেকে তুলে আনো। দেখবে টিনের চাক্‌তিখানা বিশেষভাবে পজিটিভ তড়িতাবিষ্ট হয়েছে এবং চাক্‌তির কিনারার কাছে হাত আনলেই বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ দেখা যাবে। চাক্‌তিটাকে আবার রজনের উপর রেখে আঙ্‌ুল দিয়ে স্পর্শ

করো এবং পরক্ষণেই তুলে আনো। দেখবে, পূর্বের মতই বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ দেখা যাচ্ছে। এইরূপে বার বার বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ উৎপাদন করা যায়; অবশ্য অনেকক্ষণ পর পর রজনের চাক্তিটাকে বেশ করে ঘষে দিতে হয়।



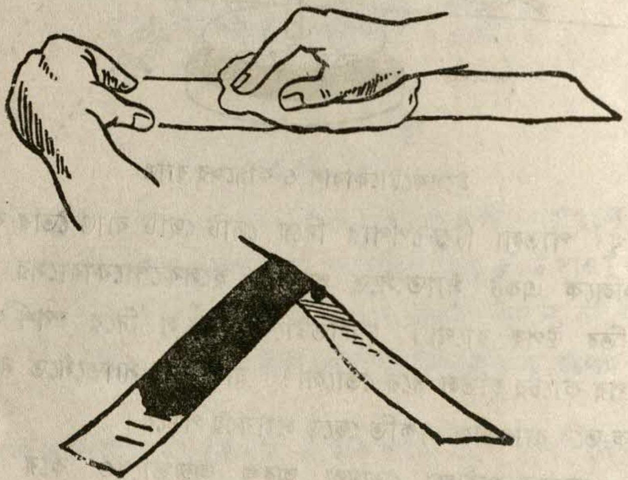
ইলেকট্রোফোরাস ও কাগজের ব্যাঙ

খুব পাতলা টিস্যু-পেপার দিয়ে ছোট ছোট ব্যাঙ তৈরি করো। সেগুলিকে একটু স্যাঁতসেঁতে অবস্থায় ইলেকট্রোফোরাসের টিনের চাকতির উপর রাখো। চাকতিটাকে আঙুল দিয়ে স্পর্শ করো। তারপর কাচের হাতল ধরে তোলো। যদি বেশী স্যাঁতসেঁতে না হয়ে থাকে তবে ব্যাঙগুলি চাকতি ছেড়ে লাফিয়ে পড়বে।

এ-ধরনের পরীক্ষা তোমরা অবশ্য অন্যভাবেও করে দেখতে পারো। টেবিলের উপর দু-দিকে কয়েকখানা বই—একখানার উপর আর একখানা সাজিয়ে প্রায় চার ইঞ্চি উঁচু করো। সেই বইয়ের উপর একখানা কাচ রাখো। টিস্যু-পেপারের ছোট ছোট মানুষ, ব্যাঙ ইত্যাদি তৈরি করে কাচের নীচে রাখো। এক টুকরো রেশমী কাপড় দিয়ে অথবা খালি হাতেই কাচখানাকে আলতোভাবে ঘষতে থাকো। কিছুক্ষণ ঘষবার পরেই দেখবে, টিস্যু-পেপারের মূর্তিগুলি লাফালাফি শুরু করে দিয়েছে। এই পরীক্ষা শুষ্ক আবহাওয়াতেই ভালো হয়।

তড়িতাবিষ্ট পদার্থের খেলা

১নং ছবির মত করে ২ ফুট লম্বা ও ২ ইঞ্চি চওড়া একখানি খবরের কাগজ কেটে নাও। কাগজের ফালিটার মাঝামাঝি জায়গায় একটা ভাঁজ দিয়ে নিতে হবে। কাগজটার এক প্রান্ত চেপে ধরে পশমী কাপড় দিয়ে বেশ খানিকক্ষণ ঘষে দিলেই সেটা ঋণ-তড়িতাবিষ্ট হয়ে

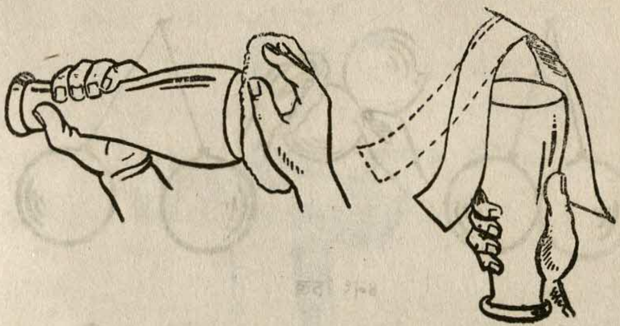


১নং চিত্র

যাবে। এবার ফালিটাকে দু-ভাঁজ করে কোন কিছুর উপর ঝুলিয়ে দিলে দেখবে—ফালির দুটি বাহু দু-দিকে ছড়িয়ে যাবে, কিছুতেই একত্রিত হয়ে থাকবে না। কারণ, একই রকম তড়িতাবিষ্ট পদার্থ পরস্পরকে দূরে ঠেলে দেয়।

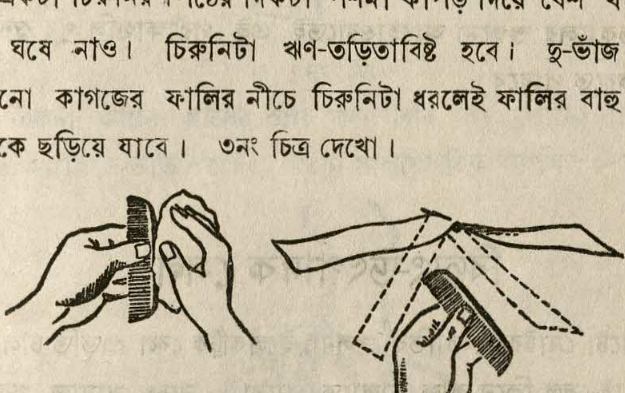
আচ্ছা, এবার একটা কাচের বোতলকে রেশমী রুমাল দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ঘষে দাও। বোতলটা ধন-তড়িতাবিষ্ট হবে। তড়িতাবিষ্ট বোতলটাকে ঐ ছড়ানো কাগজের ফালিটার নীচে ধরো। দেখবে, এবার আর ফালি দুটো ছড়িয়ে থাকবে না, বোতলের গায়ে এসে লেগে

যাবে। কারণ বিপরীত তড়িতাবিষ্ট পদার্থ পরস্পরকে আকর্ষণ করে। ২নং চিত্র দেখো।



২নং চিত্র

একটা চিরুনির পিঠের দিকটা পশমী কাপড় দিয়ে বেশ খানিকক্ষণ ঘষে নাও। চিরুনিটা ঋণ-তড়িতাবিষ্ট হবে। দু-ভাঁজ করা ঝুলানো কাগজের ফালির নীচে চিরুনিটা ধরলেই ফালির বাহু দুটো দু-দিকে ছড়িয়ে যাবে। ৩নং চিত্র দেখো।

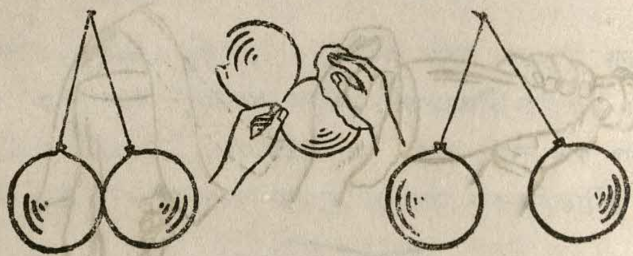


৩নং চিত্র

জলের কল অল্প করে খুলে দাও, যেন সরু নলে জল পড়তে থাকে। এবার পশম-ঘষা চিরুনির পিঠের দিকটা জলের সরু নলের সমান্তরালে ধরো। দেখবে, জলের ধারাটা চিরুনির দিকে আকৃষ্ট হওয়ার ফলে বেঁকে যাচ্ছে।

রবারের দুটো বেলুন সুতায় বেঁধে একসঙ্গে ঝুলিয়ে দাও। দুটোই

গায়ে গায়ে ঠেকে একসঙ্গে ঝুলে থাকবে। এবার বেলুন ছুটোকে পশমী কাপড় দিয়ে ঘষে দাও। দেখবে একই রকম তড়িতাবিষ্ট



৪নং চিত্র

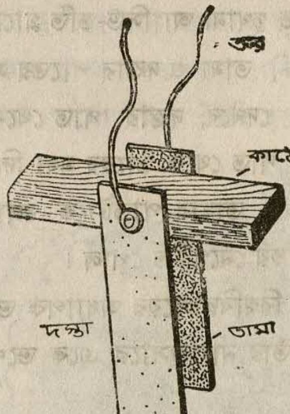
হওয়ার ফলে বেলুন ছুটো তখন পরস্পর থেকে দূরে সরে গিয়ে ঝুলছে। ৪নং চিত্র দেখো।

শীতকালের শুকনো আবহাওয়াতেই এই পরীক্ষাগুলি খুব সুন্দর-ভাবে করতে পারবে।

বিদ্যুৎ-উৎপাদক সেল

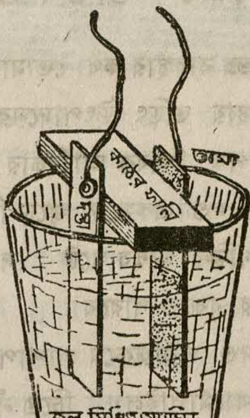
ছোটখাটো মোটর, বৈদ্যুতিক খেল্‌না, ইলেকট্রিক বেল প্রভৃতি চালাতে হলে ড্রাই-সেল কিনে কাজ চালাতে পারো। নচেৎ সামান্য খরচায় তড়িৎ-উৎপাদক সেল তৈরি করে নেওয়া যায়। সহজ উপায়ে সেল তৈরি করতে হলে প্রায় সাড়ে তিন ইঞ্চি লম্বা, এক ইঞ্চি চওড়া এক-খানা তামার পাত এবং একখানা দস্তার পাত যোগাড় করতে হবে। আর দরকার হবে জল-মেশানো খানিকটা সালফিউরিক অ্যাসিড। তামা ও দস্তার পাতের উপরের দিকে ছুটো ছিদ্র করে নাও। স্ক্রু দিয়ে একখানা কাঠের গায়ে ছু-দিকে পাত ছুখানা এঁটে দাও। স্ক্রু ছুটো এমনভাবে আঁটতে হবে যেন একটা আরেকটার সঙ্গে ঠেকে

না যায়। কেমন করে আঁটতে হবে ১নং চিত্র দেখেই বুঝতে পারবে। তুখানা পাতের স্ক্রুর মাথার সঙ্গে তু-টুকরো সরু তার জুড়ে দিতে হবে।



১নং চিত্র

একটা কাচের গ্লাসের প্রায় গলা অবধি জল মেশানো সালফিউরিক অ্যাসিডে ভর্তি করো। যতটা সালফিউরিক অ্যাসিড নেবে, তার



২নং চিত্র

প্রায় দশ গুণ জল মেশাতে হবে। একথা সর্বদা মনে রাখবে, ঠিক-

মত মিশ্রণ তৈরি করবার জন্যে জলের মধ্যে অল্প অল্প করে অ্যাসিড ঢালতে হবে।

এবার কাঠে আঁটা পাত দুখানা অ্যাসিড-ভর্তি গ্লাসের মধ্যে বসিয়ে দাও। ২নং চিত্র দেখো। তামা ও দস্তার পাতের সঙ্গে সংলগ্ন তার দুটির মুখ একত্র করলেই দেখবে, দস্তার পাত থেকে বুদবুদ উঠতে শুরু করেছে এবং তামার পাত থেকে তারের মধ্য দিয়ে দস্তার পাতে তড়িৎস্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। তামার পাতটাকে বলা হয় পজিটিভ এবং দস্তার পাতটাকে বলা হয় নেগেটিভ পোল।

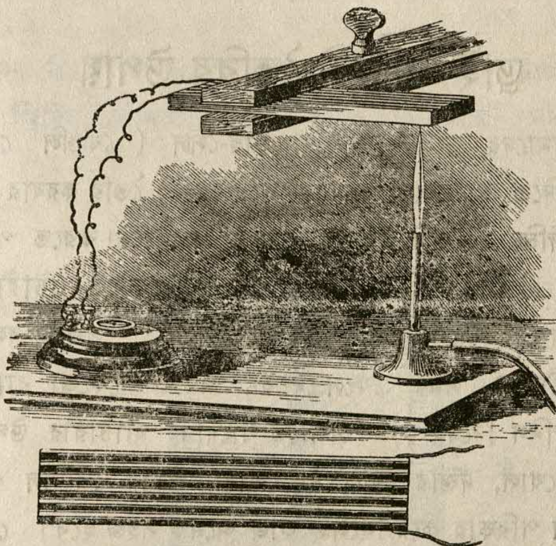
১৭৪৬ সালে প্যাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভল্টা এই তড়িৎ-কোষ উদ্ভাবন করেন। তাঁর নামানুসারে একে ভল্টেইক সেল বলা হয়।

তাপ প্রয়োগে তড়িৎ উৎপাদন

তড়িৎ উৎপাদনের বিভিন্ন ব্যবস্থার কথা তোমাদের পূর্বে বলা হয়েছে। এবার একটা সহজ ব্যবস্থায় তড়িৎ উৎপাদনের কথা বলছি। ১৮২১ সালে বার্লিনের অধ্যাপক সিবেক আবিষ্কার করেন যে, তড়িৎ-পরিচালক দুটি বিভিন্ন ধাতুর দণ্ড একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে জোড়ামুখে তাপ প্রয়োগ করলে তড়িৎ-শক্তির উন্মেষ ঘটে সাধারণ একটা পরীক্ষাতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝতে পারবে

বিভিন্ন ধাতুর দুটি দণ্ড পর্যায়ক্রমে পাশাপাশি জুড়ে যে জিনিসটা তৈরি হয়, তাকে বলে থার্মোপাইল। চিত্রে নীচের দিকে এই ধরনের একটি থার্মোপাইলের নমুনা দেখানো হয়েছে। এই থার্মোপাইলে আছে পিতল এবং জার্মান সিলভারের কয়েকটি দণ্ড—অভ্রের পাতা দিয়ে পরস্পর থেকে পৃথক করে পরিবর্তীভাবে পাশাপাশি সাজানো

অর্থাৎ .একটা পিতলের দণ্ডের পরে আছে অভ্রের পাত, আর তার পরেই আছে একটা জার্মান সিলভারের দণ্ড। এই দুটো দণ্ডের এক প্রান্তে রাং-ঝাল দিয়ে দুটোকে একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এই-রূপে আরও কয়েক জোড়া দণ্ড পাশাপাশি রেখে পরিবর্তীভাবে পর পর জুড়ে দিলেই থার্মোপাইল তৈরি হবে। মোটের উপর, ভিন্ন



থার্মোপাইলে তাপ প্রয়োগে তড়িৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা।
নীচে থার্মোপাইল বড় করে দেখানো হয়েছে

ভিন্ন ধাতু একটার পর একটা জুড়ে জিনিসটা তৈরি করতে হবে। এবার থার্মোপাইলের রাং-ঝালের বিপরীত প্রান্তে দু-দিকের দুটি দণ্ডের সঙ্গে সরু তার জুড়ে রাং-ঝাল দেওয়া প্রান্তে উত্তাপ প্রয়োগ করলেই তড়িৎ উৎপন্ন হবে। পাইলটি যদি অনেকগুলি দণ্ড মিলিয়ে তৈরি করা যায়, তবে তারের সঙ্গে ছোট্ট একটি পি-ল্যাম্প লাগালেই সেটা জ্বলে উঠবে। পাইলে দণ্ডের সংখ্যা কম থাকলে অন্যভাবেও তড়িৎ-প্রবাহের অস্তিত্ব পরীক্ষা করা যায়। বাজারে খুব কম দামে কৌটায় বসানো একরকম চুম্বক-কম্পাস কিনতে পাওয়া যায়। এই

রকমের একটা কম্পাসের চারদিকে, থার্মোপাইলের সঙ্গে সংযুক্ত তারটাকে কয়েক ফেরতা জড়িয়ে নিয়ে তারের মুখ দুটো একত্র করলেই তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হওয়ার ফলে চুম্বক-শলাকার স্থান পরিবর্তন ঘটতে দেখা যাবে।

ড্রাই ব্যাটারী তৈরির উপায়

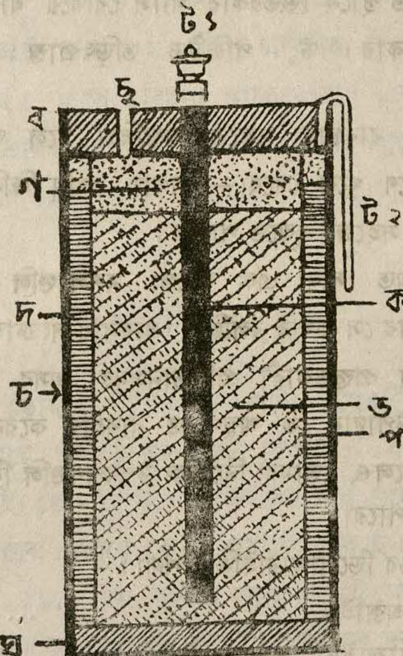
এবার তোমাদের ড্রাই-ব্যাটারী বা ড্রাই-সেল (যেগুলি তোমরা টর্চ ইত্যাদিতে হামেশাই ব্যবহার করে থাক) তৈরি করবার উপায় জানিয়ে দিচ্ছি। তৈরি করবার জন্যে তোমরা চেষ্টা করতে পারো।

প্রথম চেষ্টাতে সব জিনিস কিনে এনে নিখুঁতভাবে ব্যাটারী তৈরি করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব না-ও হতে পারে। সেজন্যে বলছি—প্রথম পরীক্ষার সময় ফেলে-দেওয়া, অর্থাৎ অকেজো ব্যাটারীর অনেক জিনিস দিয়েই কাজ চালাতে পারো। ব্যাটারীর উপরকার কাগজের খোল, দস্তার খোল বা কৌটা, কার্বন পেন্সিল প্রভৃতি জিনিসগুলি পরিষ্কার করে নিলেই কাজ অনেক সহজ হবে। মোটের উপর, নিঃশেষিত ব্যাটারীর মশলাগুলি ফেলে দিয়ে নতুন মশলার সাহায্যে সেগুলিকে পুনরায় ব্যবহারোপযোগী করে তুলতে পারলে সুবিধা।

এখন ব্যাটারীর কথা বলছি। ড্রাই-ব্যাটারী বা ড্রাই-সেল কথাটায় শুষ্ক তড়িৎ-কোষ বুঝায়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক কোন তড়িৎ-কোষ থেকে তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হতে পারে না। সাধারণ ব্যাটারীতে তরল ইলেকট্রোলাইট ব্যবহৃত থাকে। সাধারণ ব্যাটারী যতই ছোট হোক-না-কেন, এই তরল পদার্থের জন্যে যে-কোন অবস্থায় ইচ্ছামত ব্যবহার করা সম্ভব নয়। এই অসুবিধা দূর করবার জন্যেই ড্রাই-ব্যাটারী উদ্ভাবিত হয়েছে

যে-কোন অবস্থায় যেখানে-সেখানে ড্রাই-ব্যাটারী ব্যবহার করা যেতে পারে ; উল্টে রাখলেও ভিতরকার জিনিস গড়িয়ে পড়বার ভয় নেই। ড্রাই-ব্যাটারীতে যে মশলা ব্যবহৃত হয় সেটা তরল নয়, কাই-এর মত একটা নরম পদার্থ। এই কাই-এর মত নরম মশলাটা যাতে একেবারে শুকিয়ে না যায়, মশলার উপাদানে তারও ব্যবস্থা রয়েছে।

এখন চিত্রটাকে ভালো করে দেখে নাও। ব্যাটারীর ভিতর কি কি জিনিস, কোথায় কিভাবে বসাতে হবে, চিত্রে সেটা দেখানো



ড্রাই-ব্যাটারীর ভিতরকার অংশ দেখানো হয়েছে

হয়েছে। চ হচ্ছে কাগজের খোল, তার মধ্যে বসানো হয়েছে দ-চিহ্নিত দস্তার কৌটা বা খোল। দস্তার কৌটাটার উপরের মুখ খোলা আর নীচের মুখ বন্ধ। দস্তার খোলের তলার দিকে এঁটে

বসানো আছে ঘ-চিহ্নিত কার্ডবোর্ডের চাক্‌তি। কার্ডবোর্ডের চাক্‌তি তড়িৎ-অপরিচালক, অর্থাৎ ইনসুলেটরের কাজ করে। দস্তার কৌটার ভিতরের দিকের গায়ে প-চিহ্নিত স্থানে সাদা কাই-এর মত একটা জিনিসের আস্তরণ আছে। ড-চিহ্নিত জায়গায় ভর্তি করতে হবে কালো রঙের ডিপোলারাইজিং মশলা। এই মশলার মধ্যস্থলে বসানো থাকবে ক-চিহ্নিত কার্বন পেন্সিল। গ-চিহ্নিত স্থান করাতের গুঁড়া বা কার্ড-বোর্ডের চাক্‌তি দিয়ে আঁটা থাকবে। তার উপরে ব-চিহ্নিত স্থানে বিটুমেন গলিয়ে সিল করে দিতে হবে। সিলের ছ-চিহ্নিত স্থানে ভিতরকার গ্যাস বেরিয়ে যাবার জন্যে ছোট্ট ছিদ্র রাখা দরকার। $ট_১$ পজিটিভ তড়িৎপ্রান্ত; $ট_২$ নেগেটিভ তড়িৎ-প্রান্ত।

চিত্র দেখে ব্যবস্থাটা বুঝতে অসুবিধা হলে অকেজো একটা ব্যাটারী সন্তর্পণে খুলে দেখো—কোথায় কোন্ জিনিস কেমনভাবে বসানো হয়েছে, সহজেই বুঝতে পারবে।

কাই-এর মত সাদা এবং কালো মশলাগুলি কিভাবে তৈরি করতে হবে, এবার সে কথাই বলছি। ব্যবসায় সংক্রান্ত গোপনীয়তার জন্যে ড্রাই-সেল প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এসব মশলা তৈরিতে কোন্ কোন্ উপাদান কি অনুপাতে ব্যবহার করেন, তা জানবার উপায় না থাকলেও, তোমরা নিম্নোক্ত উপকরণগুলি লিখিত অনুপাতে ব্যবহার করতে পারো।

কালো রঙের ডিপোলারাইজিং মশলা :—

ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড	...	১০ পাউণ্ড
কার্বন অথবা গ্র্যাফাইট (অথবা ভুটোই)	...	১০ পাউণ্ড
স্যাল-অ্যামোনিয়াক	...	২ পাউণ্ড
জিঙ্ক ক্লোরাইড	...	১ পাউণ্ড

সবগুলি পদার্থ একত্র করে প্রয়োজনমত জল দিয়ে নরম কাই-এর মত তৈরি করবে। জিঙ্ক ক্লোরাইড থাকবার ফলে মশলাটা কখনও

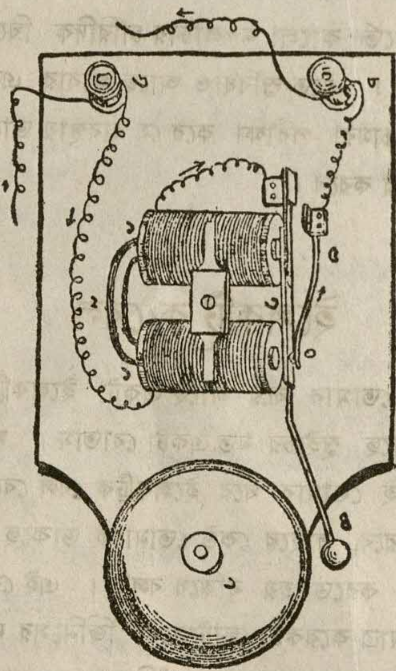
একেবারে শুকিয়ে যাবে না। মাপমত একটা চোঙ বা ছাঁচের মধ্যে কার্বন পেন্সিলটাকে ঠিক মধ্যস্থলে রেখে কালো মশলাটা বেশ এঁটে বসিয়ে দেবে। তারপর কার্বন সমেত মশলাটাকে ছাঁচ থেকে তুলে এনে দস্তার কৌটার মধ্যে বসিয়ে দিতে হবে। তার চারধারে যে সামান্য ফাঁক থাকবে সেই ফাঁকের মধ্যে তারপর সাদা কাই-এর মত মশলা ঢেলে দেবে। রেখে দিলেই সেটা আস্তে আস্তে জমে বসে যাবে।

ময়দা, প্লাস্টার অব প্যারিসের সঙ্গে কিছুটা স্যাল-অ্যামোনিয়াক এবং জিঙ্ক ক্লোরাইড মিশিয়ে প্রয়োজনমত জল দিয়ে সাদা কাই-টা তৈরি করতে হবে। কোন কোন প্রস্তুতকারক অবশ্য এই সাদা মশলাটার পরিবর্তে কালো মশলাটার চারিদিক ঘিরে একখণ্ড ব্লটিং পেপার মুড়ে দেন। এতে সুবিধাও আছে আবার একটু অসুবিধাও আছে। তবে তোমরা পরীক্ষা করে যে ব্যবস্থায় ভালো ফল পাওয়া যায়, তাই ব্যবহার করবে।

ইলেকট্রিক বেল

বাড়ীর ভিতরে তোমার ঘরে আছে একটা ইলেকট্রিক বেল, আর সদর দরজায় আছে সুইচের মত একটা বোতাম। সদর দরজায় এই বোতাম টিপ্‌লেই তোমার ঘরে ইলেকট্রিক বেল বেজে উঠবে এবং তুমি বুঝতে পারবে, বাইরে কেউ তোমাকে ডাকছে। কেমন করে এই বেল তৈরি করতে হয় বুঝিয়ে বলছি। এই বেল তৈরি করা খুবই সহজ। মাত্র কয়েকটা ছোটখাটো জিনিসের দরকার। সুতা জড়ানো বা এনামেল-করা হাত পঁচিশেক ২৮ নং তামার তার, সাইকেলের বেলের উপরকার একটি বাটি, U অক্ষরের মত বাঁকানো একটা নরম লোহার শিক (ইস্পাতের নয়), ঘড়ির কয়েক টুকরো ভাঙা স্প্রিং আর আধ ইঞ্চি পুরু, ৭।৮ ইঞ্চি লম্বা, তিন ইঞ্চি

কি সাড়ে তিন ইঞ্চি চওড়া একখণ্ড কাঠ এবং কয়েকটা স্ক্রু যোগাড় করতে হবে। এবার ছবিটা ভালো করে দেখো। ছবির মত করে জিনিসগুলোকে যথাস্থানে বসাতে হবে। প্রথমে U অক্ষরের মত বাঁকানো ২নং লোহার শিকটার দু-দিকে ১,১ নম্বরের মত দুটো সুতার কাটিম বসাও। তারপর ২৮ নম্বরের তারটাকে দু-দিকে দুটো লম্বা মুখ রেখে কাটিম দুটোর গায়ে ছবির মত করে জড়িয়ে দাও। পঁচিশ হাত তারের অর্ধেকটা জড়াবে একটা কাটিমে, বাকী অর্ধেকটা জড়াবে অপর কাটিমে। প্রথম কাটিমটাতে ডান পাক দিলে দ্বিতীয়টাতে দেবে বাঁ-পাক। এবার U অক্ষরের মত লোহার গায়ে



ইলেকট্রিক বেল

তার জড়ানো সব জিনিসটাকে ছবির মত করে কাঠখানার উপর আটকে দাও। কাঠের উপর ৩ নম্বরের পাতের মত একটা স্প্রিং স্ক্রু দিয়ে বসাও। আর একটু উপরে ৫ নম্বরের মত একটা স্প্রিং এঁটে

দাও। এই স্প্রিঙের মাথাটা ৭ নম্বর স্থানে ৩ নম্বর পাতটার গায়ে লেগে থাকবে। ১,১ নম্বরের কাটিমের তারের একটা মুখ ৬ নম্বর স্ক্রুর সঙ্গে এবং অপর মুখটা ৩ নম্বর পাতটার সঙ্গে জুড়ে দাও। এবার ৫ নম্বরের স্প্রিঙের সঙ্গে একটু তার দিয়ে ৮ নং স্ক্রু যোগ করে দাও। ৩ নম্বরের পাতখানার সঙ্গে একটু তার ঝালাই করে ৪ নম্বর হাতুড়ি বসাতে হবে। ছোট্ট একটু কাঠের খুঁটির উপর ৯ নম্বরে সাইকেলের বেলের বাটিটা বসাও। এবার ১,১ নম্বর তারের তুটো মাথা ছোট্ট একটা ড্রাই-ব্যাটারীর (এগুলি সস্তা দরেই বাজারে কিনতে পাওয়া যায়) তুটো মুখের সঙ্গে জুড়ে দিলেই বেলটা বেজে উঠবে। ৮ নম্বর এবং ৬ নম্বরের তার তুটোকে যতদূর প্রয়োজন বাড়িয়ে নিতে পারো। এই তু-গাছা তারের যে-কোন একটার সঙ্গে একটা স্প্রিঙের সুইচ বসিয়ে দেবে। সুইচের বোতাম টিপলেই ব্যাটারী থেকে বিত্যুৎ-প্রবাহ চলতে থাকবে। ছেড়ে দিলেই বিত্যুৎ চলবার রাস্তা কাটা পড়বে, আর ঘণ্টা বাজবে না।

কেমন করে ঘণ্টা বাজে, এবার সেকথা বলছি। সুইচের বোতামটা টিপলেই বিত্যুৎ চলবার কাটা রাস্তা জুড়ে যায়। তখন ব্যাটারী থেকে বিত্যুৎ-প্রবাহ ৬ নম্বরের তার দিয়ে বাঁকানো লোহার গায়ে কাটিমে জড়ানো তারের মধ্য দিয়ে ৩ নম্বরের পাতে উপস্থিত হয় এবং সেখান থেকে ৭ নম্বরের সংযোগ-স্থল দিয়ে ৮ নম্বর তারের রাস্তায় পুনরায় ব্যাটারীতে ফিরে যায়। যতক্ষণ কাটিমের তারের মধ্য দিয়ে বিত্যুৎ-প্রবাহ চলতে থাকে ততক্ষণই ওই বাঁকানো লোহাটা চুম্বকের গুণ লাভ করে; বিত্যুৎ-প্রবাহ বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই লোহাটার চুম্বকের গুণও বন্ধ হয়ে যায়। কাজেই কাটিমের তারের মধ্য দিয়ে বিত্যুৎ-প্রবাহ চলবার সঙ্গে সঙ্গেই বাঁকানো লোহাটা চুম্বক-শক্তিবলে ৩ নম্বরের লোহার পাতখানাকে নীচের দিকে টেনে আনে। এতেই বেলের উপর হাতুড়ির ঘা পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে ৭ নম্বরের সংযোগ-স্থলে ফাঁক হয়ে পড়ে। এই ফাঁক হওয়ার অর্থ—বিত্যুৎ

চলবার পথ কেটে যাওয়া, অর্থাৎ বিদ্যুৎ-প্রবাহ বন্ধ হওয়া। প্রবাহ বন্ধ হওয়ামাত্রই লোহার চুম্বকশক্তিও লোপ পায়, কাজেই সঙ্গে সঙ্গে ৩ নম্বর পাতখানাকেও ছেড়ে দেয়। ৩নং পাতখানা ছাড়া পেয়ে আবার ৭ নম্বরের সঙ্গে সংযোগসাধন করে। তৎক্ষণাৎ আবার বিদ্যুৎ চলতে থাকে এবং ২নং চুম্বক, ৩ নম্বরের পাতখানাকে টেনে নিয়ে বিদ্যুৎ চলবার পথ বিচ্ছিন্ন করে। এভাবে অনবরত ফাঁক ও সংযোগ হতে থাকে এবং ঘণ্টাও বাজতে থাকে।

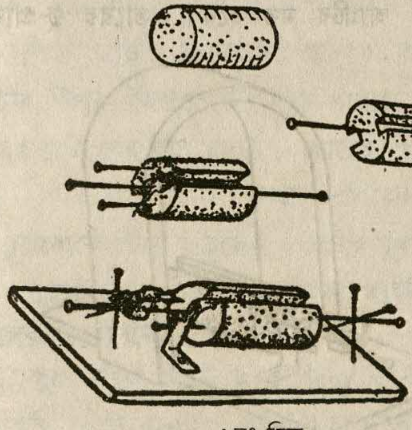
ইলেকট্রিক মোটর

ইলেকট্রিক মোটর জিনিসটা আজকাল কারো কাছে অপরিচিত নয়। তোমাদের কেউ যদি ইলেকট্রিক মোটর না-ও দেখে থাক, অন্ততঃ ইলেকট্রিক ফ্যান দেখেছ নিশ্চয়। যার সাহায্যে ফ্যান ঘোরে সেটাও এক রকমের ইলেকট্রিক মোটর। তড়িৎ-প্রবাহিত তারের দু-প্রান্ত সংযোগ করলেই মোটর ঘুরতে থাকে। ইলেকট্রিসিটি অর্থাৎ তড়িতের সাহায্যে কেমন করে মোটর ঘোরে, সেকথা পরে বুঝতে পারবে। অতি সহজ উপায়ে কেমন করে ইলেকট্রিক মোটর তৈরি করে দেখতে পারো, সে কথাই তোমাদের বলছি।

এই রকম ইলেকট্রিক মোটর তৈরি করতে হলে খানিকটা কর্ক, আলপিন, চুলের কাঁটা, পাতলা টিনের পাত, ঘোড়ার নালের মত একটা চুম্বক-লোহা এবং খানিকটা ইনসুলেটেড সরু তামার তার যোগাড় করতে হবে।

প্রথমে ১নং চিত্রের উপরের দিকের নমুনার মত লম্বা অথচ গোল একখণ্ড কর্ক নাও। ধারালো ছুরি অথবা ক্ষুরের ব্লেড দিয়ে উপরের ডান দিকের ছবির মত করে কর্কটার দু-দিকে লম্বালম্বি দুটো খাঁজ কেটে নাও। ঠিক মধ্যস্থলে—কর্কটার দু-দিকে দুটো আলপিন বসাও। লম্বা একটা চুলের কাঁটা লম্বালম্বি এফোঁড়-ওফোঁড় করে বসালেও

চলবে। জিনিসটা দেখাবে অনেকটা ঘুড়ির লাটাইয়ের মত। মাঝের ছবিটার মত করে কর্কের এক প্রান্তে দুদিকে আরও দুটো আলপিন বসাও। এবার সরু ইনস্যুলেটেড তামার তারটাকে কর্কের খাঁজের মধ্যে ছবির মত করে কয়েক ফেরতা জড়িয়ে দাও। তারের প্রান্তভাগ ভালো করে চেঁচে কর্কের প্রান্তভাগের আলপিন দুটোর সঙ্গে চেপে জড়িয়ে দিতে হবে। তার-জড়ানো কর্কটাই হলো মোটরের আরমেচার।



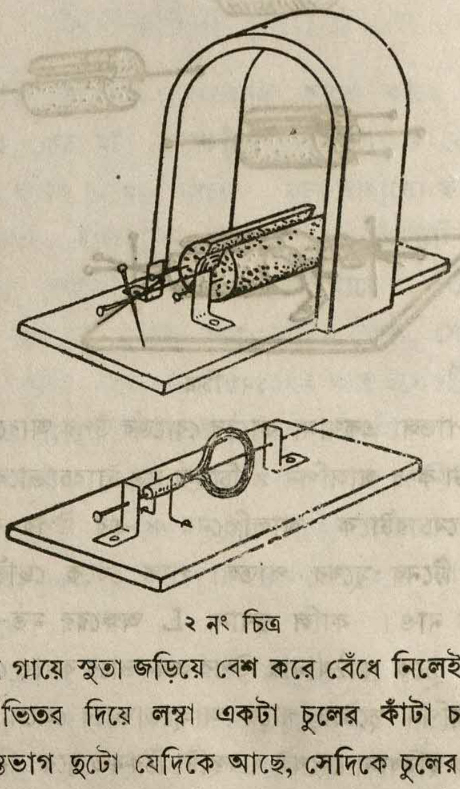
১নং চিত্র

এবার পাতলা একখানা কাঠের বোর্ডের উপর আরমেচারের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী দুটো করে আলপিন × চিহ্নের মত ট্যারচাভাবে বসিয়ে দিতে হবে। আরমেচারটাকে আলপিনের ×-এর উপর বসিয়ে দাও। সিগারেটের টিনের মুখের পাতলা পাত থেকে ছোট দুখানা সরু ফালি কেটে নাও। ফালি দুখানা L অক্ষরের মত বাঁকিয়ে নিয়ে সরু পেরেক ঠুকে কাঠখানার উপর এমনভাবে বসাও যেন কর্কের দু-পাশের আলপিন দুটোর গায়ে আল্‌তোভাবে লেগে থাকে। ১নং চিত্রের নীচের ছবিখানা দেখেই ব্যবস্থাটা ঠিকমত বুঝে নিতে পারবে।

২নং চিত্রের উপরের ছবিটার মত করে ঘোড়ার নালের মত একটা চুম্বক-লোহা আরমেচারের উপর দিয়ে বসিয়ে দাও। একটা

টর্চের ব্যাটারীর দু-প্রান্ত থেকে দুটো তার নিয়ে টিনের পাত দুটোর সঙ্গে লাগিয়ে দিলেই আরমেচারটা ঘুরতে থাকবে। এ থেকেই ইলেকট্রিক মোটর ঘোরাবার কৌশলটা মোটামুটিভাবে বুঝতে পারবে।

কর্ক না দিয়ে শুধু ইনসুলেটেড তামার তার জড়িয়েও আরমেচার তৈরি করতে পারো। ২নং চিত্রের নীচের ছবিটা দেখো। একটা পেন্সিলের উপর তামার তারটাকে উপর্যুপরি কয়েক ফেরতা জড়িয়ে খুলে নিলেই একটা আংটির মত হবে। তারের দু-প্রান্ত বাইরে



২ নং চিত্র

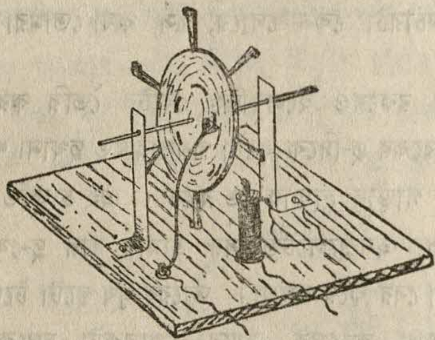
রেখে আংটির গায়ে সুতা জড়িয়ে বেশ করে বেঁধে নিলেই ভালো হয়। তারপর এর ভিতর দিয়ে লম্বা একটা চুলের কাঁটা চালিয়ে দাও তারের প্রান্তভাগ দুটো যেদিকে আছে, সেদিকে চুলের কাঁটার গায়ে সরু এক ফালি কাগজ বেশ একটু পুরু করে জড়িয়ে আঠা দিয়ে জুড়ে দাও। তার উপর তারের প্রান্ত দুটো পরস্পরের বিপরীত দিকে

রেখে সুতা দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। আলপিনের খুঁটির বদলে খুব পাতলা টিনের পাতে ফুটো করে আরমেচার ঘোরাবার ব্যবস্থা করতে পারো। এর উপর চুম্বক-লোহা বসিয়ে পূর্বোক্ত ব্যবস্থায় টর্চের ব্যাটারীর সঙ্গে যোগ করে দিলেই আরমেচার ঘুরতে থাকবে। এই ব্যবস্থায় আরমেচারটা কেন ঘোরে, সে কথা তোমরা পরে জানতে পারবে।

এছাড়া অন্য রকমেও ইলেকট্রিক মোটর তৈরি করতে পারো। একটা লম্বা পেরেকের দু-দিকে ফুটো পয়সার মত দুখানা শক্ত কাগজের চাক্‌তি বসিয়ে গাড়ীর চাকার মত করো। এই চাক্‌তি দুটোর মধ্যে পেরেকটার উপর ইনসুলেটেড সরু তামার তার দু-ফেরতা জড়িয়ে তারের মুখ দুটো বের করে রাখো। তারের মুখ দুটো টর্চের ব্যাটারীর দু-প্রান্তে সংযোগ করলেই দেখবে—পেরেকটা চুম্বকের মত অন্য লোহার টুকরোকে টেনে ধরেছে। তারের মুখ ব্যাটারী থেকে সরিয়ে নিলেই পেরেকটার আর চৌম্বক শক্তি থাকবে না। এটাকে বলা হয়—ইলেকট্রোম্যাগনেট।

এবার পুরু কাগজ থেকে ৬ সেন্টিমিটার ডায়মেটারের তিনখানা গোল চাক্‌তি কেটে নাও। একখানা চাক্‌তির চারধারে সমান দূরত্বে খাড়াভাবে ৬টা খাঁজ কাটো। এই খাঁজগুলির মধ্যে ৬টা চ্যাপ্টা কাটা পেরেক বসিয়ে চাক্‌তিটার দু-পিঠে অপর চাক্‌তি দুখানা আঠা দিয়ে জুড়ে দাও। পেরেকগুলির মাথা চাক্‌তি থেকে খানিকটা বাইরে বেরিয়ে থাকবে। এবার দুই সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ নিয়ে চাক্‌তিটার মধ্যস্থলে একটা বৃত্ত এঁকে সেই লাইন ধরে সমান দূরত্বে ১২টা ছিদ্র করো। এই ছিদ্রের ভিতর দিয়ে ১৮ নম্বরের একগাছা খোলা তামার তার এফোঁড়-ওফোঁড় করে সেলাই করে দিলে চাক্‌তির এক-একদিকে ৬টা করে খোলা অংশ বেরিয়ে থাকবে। চাক্‌তিটার ঠিক মধ্যস্থলে একটা চুলের কাঁটা এদিক-ওদিক ফুঁড়ে দাও। সেলাই-করা তারের লম্বা মুখটা চুলের কাঁটার গায়ে জড়িয়ে

দিতে হবে। একখানা পাতলা কাঠের উপর টিনের পাতের খুঁটি এঁটে চাক্‌তিখানাকে চাকার মত করে বসিয়ে দাও। সরু অথচ লম্বা একফালি টিনের পাত কাঠের উপর বসিয়ে উপরের দিকটা এমনভাবে বাঁকিয়ে দাও যাতে সেলাই-করা তারটার গায়ে আল্‌তোভাবে চেপে



৩নং চিত্র

থাকে। এবার পেরেকের উপর তার জড়ানো ইলেকট্রোম্যাগনেট্‌টাকে কাঠখানার উপর এমনভাবে বসাও যেন চাক্‌তিটা ঘোরালে ধারের পেরেকগুলি পর পর ইলেকট্রোম্যাগ্‌নেটের পেরেকটার খুব কাছে আসে অথচ তার গায়ে ঠেকে না। ইলেকট্রোম্যাগ্‌নেট্‌টার তারের এক-প্রান্ত টিনের পাতের খুঁটির সঙ্গে জুড়ে দাও। অপর প্রান্ত ব্যাটারীতে সংযোগ করতে হবে। ব্যাটারী থেকে আর একটা তার টিনের সরু বাঁকানো ফালিটার সঙ্গে জুড়ে দিলেই চাক্‌তিখানা ঘুরতে থাকবে। ৩নং ছবিটা ভালো করে দেখে নিলেই কৌশলটা বুঝতে পারবে।

ইলেকট্রোপ্লেটিং

সচরাচর আমরা রুপার মত ঝক্‌ঝকে চায়ের চামচ ও অন্যান্য যে সব জিনিস ব্যবহার করে থাকি, সেগুলি যে রুপার তৈরি নয়, একথা বোধহয় তোমাদের কারুরই অজানা নয়। কিছুকাল ব্যবহারের

পরেই দেখা যায়—ওসব জিনিসের রুপার মত ঝকঝকে আবরণটা উঠে গিয়ে পিতলের রং বেরিয়ে পড়েছে। পিতলের তৈরি জিনিসের উপর নিকেলের পাতলা একটা আস্তরণ দেওয়া থাকে বলে রুপার মত চকচকে দেখায়। ইলেকট্রোপ্লেটিং নামে একরকম সহজ প্রক্রিয়ায় এই আস্তরণ দেওয়া হয়। প্রক্রিয়াটা এত সহজ যে, ইচ্ছা করলে তোমরাও অনায়াসে করে দেখতে পারো। কেমন করে ইলেকট্রোপ্লেটিং করতে হয়, সেকথা বলছি।

সোনা বা রুপার গিল্‌টি-করা* নানারকমের জিনিস তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। তামা ও পিতলের তৈরি জিনিসপত্রের উপর গিল্‌টি করবার রেওয়াজ অনেককাল থেকেই প্রচলিত। পূর্বে আরও সহজ উপায়ে গিল্‌টি করা হতো। পারার সঙ্গে সোনা মিশিয়ে সে জিনিসটাকে তামা, পিতল প্রভৃতি ধাতুনির্মিত জিনিসের গায়ে মাখিয়ে দেওয়া হতো। তারপর সেই জিনিসটাকে চুল্লীতে উত্তপ্ত করলেই পারা উবে গিয়ে সোনার সূক্ষ্ম আস্তরণ তার গায়ে লেগে থাকতো। রুপার আস্তরণ দেবার জন্যেও এই প্রক্রিয়ারই প্রচলন ছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থাটা যেমন ব্যয়সাধ্য তেমনই অস্বাস্থ্যকর। কাজেই ইলেকট্রো-প্লেটিং-এর ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হওয়ার পর এই প্রক্রিয়ার প্রচলন বন্ধ হয়ে যায়।

ক্রুগ্নেটেলি নামে ভল্টার জনৈক ছাত্র ১৮০৩ সালে পরীক্ষার ফলে দেখতে পান যে, সোনার ক্ষারধর্মী দ্রাবণের ভিতর দিয়ে ব্যাটারী থেকে তড়িৎ-স্রোত পরিচালন করে ধাতব পদার্থকে গিল্‌টি করা যেতে পারে। ডিলারাইভ-ই প্রকৃত প্রস্তাবে এই ব্যবস্থাকে কাজে লাগান। তারপর ক্রমে ক্রমে এলকিংটন, রুয়োলজ এবং অন্যান্য আরও অনেকের প্রচেষ্টায় ইলেকট্রোপ্লেটিং প্রক্রিয়া বর্তমান সহজসাধ্য ব্যবস্থায় উপনীত হয়েছে।

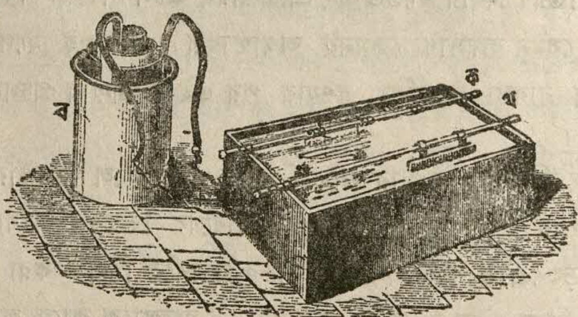
---

* গিল্‌টি করা কথাটা যদিও সোনার গিল্‌টি অর্থেই ব্যবহৃত হয় তবু সব রকম ধাতুর আস্তরণ দেওয়ার ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়েছে।

ধরো, তুমি একটা পিতলের আংটিকে সোনার গিল্‌টি করতে চাও। তোমাকে কি কি করতে হবে বলছি। প্রথমে তোমাকে একটা গ্লেজ-করা চিনামাটির বাটি বা ওই রকমের একটা কাচের পাত্র, গোটা তিনেক ব্যাটারী, খানিকটা পটাসিয়াম সায়েনাইড এবং গোল্ড ক্লোরাইড যোগাড় করতে হবে। জিনিসগুলি কেমিস্টের দোকানে কিনতে পাওয়া যায়।

রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণ তৈরি করে তাতে চীনামাটি বা কাচের পাত্রটাকে প্রায় ভর্তি করে দিতে হবে। ১ ভাগ গোল্ড ক্লোরাইড, ১০ ভাগ পটাসিয়াম সায়েনাইড এবং ২০০ ভাগ জল—এই অনুপাতে মিশ্রণটি তৈরি করবে। কিন্তু সাবধান—পটাসিয়াম সায়েনাইড ভয়ানক বিষাক্ত পদার্থ—অসতর্কতার ফলে কোনরকমে মুখে বা জিভে লেগে গেলে ভয়ানক বিপদ ঘটতে পারে।

এবার পাত্রটার উপর পরিষ্কার-করা দুটো সরু তামার রড বসিয়ে দাও। ১ নম্বরের ছবিটা ভালো করে লক্ষ্য করলেই ব্যবস্থাটা বুঝতে পারবে।

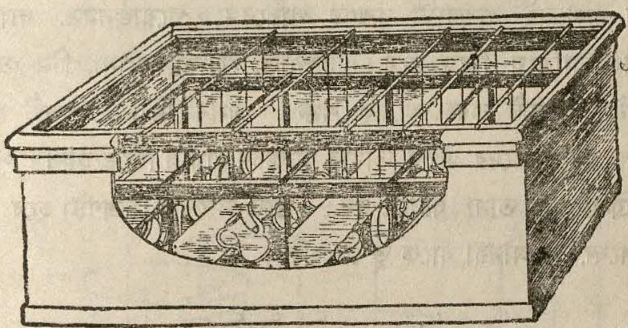


১নং চিত্র

কাচের পাত্রে মিশ্রণটা রয়েছে। পাত্রটার কানার উপরে ক ও খ চিহ্নিত দুটো তামার রড বসানো হয়েছে। ব-চিহ্নিত ব্যাটারী থেকে + চিহ্নিত পজিটিভ এবং – চিহ্নিত নেগেটিভ তার দুটোকে তামার রড দুটোর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এভাবে 'বাথ' তৈরি

এবং ব্যাটারীর ব্যবস্থা করে নিয়ে আংটিটাকে খুব ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে। প্রথমে আংটিটাকে গরম করো। গরম থাকতে থাকতে জল-মিশ্রিত হাল্‌কা নাইট্রিক অ্যাসিডে ডুবিয়ে দাও। কিছুক্ষণ অ্যাসিডে থাকবার পর কড়া ব্রাস্ দিয়ে ঘষে পরিস্রুত জলে (ডিস্টিলড্ ওয়াটার) ধুইয়ে আগুনের আঁচে আস্তে আস্তে শুকিয়ে নেবে। এর-পর আবার সাধারণ নাইট্রিক অ্যাসিডে ডুবিয়েই চট্ করে তুলে নেবে এবং নুন, ভুসাকালি ও নাইট্রিক অ্যাসিড মিশ্রিত পদার্থে ডুবিয়ে দেবে। এখান থেকে তুলে আংটিটাকে বেশ করে পরিস্রুত জলে ধুইয়ে অল্প আঁচে ধীরে ধীরে শুকিয়ে নেবে।

এবার আংটিটাকে 'বাথে'র উপরে ব্যাটারীর নেগেটিভ তার সং-লগ্ন রডের সঙ্গে সরু তারে ঝুলিয়ে মিশ্রণের মধ্যে ডুবিয়ে দাও।



২নং চিত্র

পজিটিভ তার সংলগ্ন রড থেকেও সরু তারে ঝুলিয়ে এক টুকরো সোনা মিশ্রণের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে হবে। সোনার যে-কোন একটা জিনিস ঝুলিয়ে দিলেই চলবে। কিছুক্ষণ পরে মিশ্রণ থেকে তুললেই দেখবে, আংটিটাকে আর পিতলের বলে চেনা যায় না—তার উপরে সোনার একটা সূক্ষ্ম আস্তরণ পড়ে গেছে। এই আস্তরণটাকে আরও পুরু করতে হলে আরও কিছু বেশী সময় ডুবিয়ে রাখতে হবে। তারপর পরিষ্কার জলে খুব ভালো করে ধুয়ে নিলেই হলো।

যেভাবে সোনার গিল্‌টি করা হয় ঠিক সেই প্রক্রিয়াতেই রুপা, তামা, নিকেল প্রভৃতির আস্তরণ দেওয়া হয়। তবে ভিন্ন ভিন্ন মিশ্রণ ব্যবহার করতে হবে। আংটিটাতে যদি রুপার আস্তরণ দিতে চাও তবে মিশ্রণটা হবে এরূপ ঃ—২ ভাগ সিলভার সায়েনাইড, ২ ভাগ পটাসিয়াম সায়েনাইড এবং ২৫০ ভাগ জল। আংটিটাকে ঝুলাতে হবে নেগেটিভ রডটাতে, আর পজিটিভ রড থেকে ঝুলিয়ে দিতে হবে একখণ্ড রুপা। নিকেলের আস্তরণ দিতে হলে নিকেল অ্যামোনিয়াম সালফেটের 'বাথ' ব্যবহার করতে হবে। আর পজিটিভ রড থেকে মিশ্রণের মধ্যে ঝুলিয়ে দিতে হবে একখণ্ড নিকেল।

যদি একসঙ্গে অনেকগুলি জিনিসকে গিল্‌টি করতে হয় তবে সে-গুলিকে আলাদা আলাদাভাবে রড থেকে ঝুলিয়ে দিতে হয়। ২ নম্বরের চিত্র দেখলেই ব্যবস্থাটা বুঝতে পারবে। প্রয়োজনমত ব্যাটারীর সংখ্যা বাড়িয়ে নিতে হবে। ইস্পাত, লোহা, সীসা, টিন প্রভৃতির জিনিস গিল্‌টি করা অনেক শক্ত। এসব জিনিস গিল্‌টি করতে হলে প্রথমে এদের উপর তামার আস্তরণ ধরিয়ে নিতে হয়। পূর্বোক্ত প্রক্রিয়াতেই তামা ধরাতে হয়; তবে 'বাথে'র মিশ্রণটা হবে কপার সালফেটের, আমরা যাকে তুঁতে বলি।

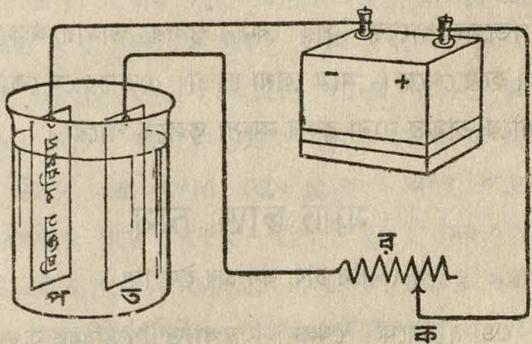
ইলেকট্রো-টাইপিং

ধরো, পিতলের পাতের উপর তামার হরফে তোমার একটা নামের প্লেট তৈরি করতে চাও; কিন্তু কেমন করে করবে? খুব সহজ একটা ব্যবস্থার কথা বলছি। ইলেকট্রোপ্লেটিং-এর কথা পূর্বেই তোমাদের বলেছি। সেই ব্যবস্থাতেই সামান্য একটু কায়দা করে পিতলের উপর তামার লেখা ফুটিয়ে তোলা যেতে পারে। এই ব্যবস্থাকে বলা হয় ইলেকট্রো-টাইপিং প্রক্রিয়া। ইলেকট্রো-টাইপিং প্রক্রিয়ায় পিতলের পাতের উপর তামার লেখা ফুটিয়ে তুলতে হলে বড় একটা কাচের

বীকার, ব্যাটারী, তামার পাত, পিতলের পাত, কিছু প্যারাফিন, তুঁতে-গোলা জল এবং অন্যান্য আরও কয়েকটি জিনিস যোগাড় করতে হবে।

পিতলের যে পাতের উপর নাম লিখবে, প্রথমে সেটাকে ভালো করে পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। প্রথমে সেটাকে গরম কষ্টিক সোডা সলিউশনে ডুবিয়ে কলের জলে ধুইয়ে নাও। তারপরে আবার হাল্‌কা সালফিউরিক অ্যাসিডে ডুবিয়ে কলের জলে ধুইয়ে নিতে হবে। কষ্টিক সোডা ও সালফিউরিক অ্যাসিড খুব সাবধানে ব্যবহার করবে যেন কোনরকমে গায়ে লেগে না যায়।

যার গায়ে নাম লিখবে সেই পিতলের পাতখানাকে সাড়াশী দিয়ে ধরে গরম করে তার দু-পিঠে এবং ধারগুলিতে প্যারাফিনের একটা টুকরো বেশ ভালো করে বুলিয়ে দাও। ঠাণ্ডা হলেই দেখবে, পাত-খানাতে প্যারাফিনের একটা পাতলা পর্দার আবরণ লেগে আছে। ছুরি বা নরুনের সরু মুখ দিয়ে প্যারাফিনের আস্তরণ কেটে কেটে তোমার নামটা লিখে দাও।



ইলেকট্রো-টাইপিং প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা

এবার কাচের বীকারের মধ্যে তুঁতে-গোলা জল ভর্তি করো। আঁকা পিতলের পাত এবং আর একখানা তামার পাতের প্রান্তভাগে ছিদ্র করে সেই ছিদ্রের সঙ্গে তার বেঁধে দাও। এই তারের সাহায্যে

ব্যাটারীর নেগেটিভ প্রান্তের সঙ্গে নাম-লেখা পিতলের পাত, আর পজিটিভ প্রান্তের সঙ্গে তামার পাত জুড়ে দিতে হবে। ছবিতে প-চিহ্নিত পিতলের পাত এবং ত-চিহ্নিত তামার পাত দেখো। তবে পজিটিভ প্রান্তে সংলগ্ন তারের সঙ্গে একটা রিওস্ট্যাট, অর্থাৎ খানিকটা রেজিস্ট্যান্স তার জুড়ে তার পরে তামার পাতটি সংযোগ করতে হবে। ছবির র-চিহ্নিত স্থানটা দেখো। ক-চিহ্নিত পজিটিভ তারের প্রান্ত রিওস্ট্যাটের বিভিন্ন জায়গায় সংলগ্ন করে ব্যাটারীর তড়িৎ-প্রবাহ ইচ্ছামত কম-বেশী করতে পারবে। এভাবে তারের সংযোগ করে পিতল ও তামার পাত দুখানা তুঁতে-গোলা জলের মধ্যে ছবির মত করে ডুবিয়ে দাও। লক্ষ্য রাখবে, পিতলের পাতের নাম-লেখা দিকটা যেন তামার পাতের দিকে থাকে।

রিওস্ট্যাটের সাহায্যে খুব ক্ষীণ তড়িৎ-প্রবাহ চালাতে থাকো। প্রায় আধ ঘণ্টা তড়িৎ-প্রবাহ চালাবার পর পিতলের পাতখানাকে তুলে এনে কলের নীচে ধুইয়ে তারপর গরম জলে ডুবিয়ে দিলে কিছুক্ষণের মধ্যে পাতের গায়ের প্যারাফিন গলে ভেসে উঠবে। তখন দেখবে, পিতলের পাতের উপর কেমন সুন্দর তামার অক্ষরে তোমার নাম লেখা হয়ে গেছে। নাম লেখা ছাড়াও এভাবে যে-কোন পিতলের পাতের গায়ে তামার নানা রকম নক্সা তুলতে পারো।

মাটি ছাড়া চাষ

(বালি-চাষ, জল-চাষ ইত্যাদি)

এ-পর্যন্ত তোমাদিগকে খেলনা যন্ত্রপাতি তৈরির কথা বলেছি। যাতে কার্যকরী কিছু একটা করতে পার, সেজন্যে এবার তোমাদিগকে চাষ-আবাদ সম্বন্ধে পরীক্ষামূলক দু-একটা কাজের কথা বলবো। তোমাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছ, যারা নিজেদের ছোট্ট বাগানে বা বাড়ীর আনাচে-কানাচে অথবা টবের মধ্যে দু-চারটে ফল-মূল ও

ফুলের গাছ লাগিয়ে আনন্দ অনুভব করে। বিশেষ করে তাদের জন্যেই বালি-চাষ ও জল-চাষের কথা আলোচনা করছি।

পরীক্ষার জন্যে মাটি থেকে একটা চারা গাছ তুলে নাও। ধরো, পাঁচ-ছ' ইঞ্চি লম্বা একটা টোমাটোর চারা তুলে নিয়েছ। শিকড়ের গায়ে যেটুকু মাটি লেগে আছে সেটুকু জলে ধুইয়ে পরিষ্কার করে ফেলো। এখন গাছটাকে এক জায়গায় ফেলে রাখলে কি হবে? গাছটা ক্রমশঃ শুকিয়ে যাবে। কিন্তু এক জায়গায় ফেলে না রেখে পরিষ্কার বালির মধ্যে পুঁতে গাছটার শিকড়ের চারদিকে যদি জল দেওয়া যায় তবে কি হবে? নিশ্চয়ই গাছটা তখন পুনরায় সতেজ হয়ে উঠবে। কারণ, জীবনধারণের উপযোগী জল এবং খাড়া থাকবার জন্যে বালির অবলম্বন—অন্ততঃ এই তুটো জিনিসও সে পেয়েছে। কিন্তু দস্তুরমত বেড়ে ওঠবার জন্যে কেবলমাত্র এই তুটো জিনিসই তার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তার খাদ্যেরও (রাসায়নিক পদার্থ) প্রয়োজন। কাজেই খাদ্য না পেলে শুধু জল আর বালির অবলম্বন তাকে বেশীদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না।

আচ্ছা, এবার বালির মধ্যে বসানো গাছটাকে যদি প্রয়োজনীয় আহার্য দেওয়া যায় তবে কি হবে? তখন দেখবে—যেন ম্যাজিকের মত আশ্চর্য ব্যাপার ঘটছে। গাছটা বালির মধ্যেই তরতর করে বেড়ে উঠছে। মাটির মধ্যে সে যতটা বাড়তো হয়তো বা তার চেয়েও বেশী বেড়ে উঠবে এবং ফলও ধরবে প্রচুর। অবশ্য কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই ব্যাপার ঘটে উঠবে না—বেশ কিছুদিন সময় লাগবে এবং মাটি ছাড়া-ই এই ব্যাপারটা সম্ভব হবে। কেবল নির্দিষ্ট সময় অন্তর অথবা অবস্থা অনুযায়ী পরিমিত মাত্রায় ক্রমাগত জল ও রাসায়নিক আহার্য পদার্থের যোগান দিতে হবে। দেহ-পুষ্টির জন্যে গাছ মাটি থেকে কি অনুপাতে কোন্ কোন্ রাসায়নিক পদার্থ গ্রহণ করে, বিজ্ঞানীরা তা ভালোরকমই জানেন। সে হিসাবে প্রথমে দিতে হয় নাইট্রোজেন, ফস্‌ফোরাস এবং পটাসিয়ামের রাসায়নিক মিশ্রণ।

তারপর ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্নেসিয়াম, সালফার প্রভৃতি পদার্থগুলি দেওয়া দরকার। অবশ্য এমন জিনিসই ব্যবহার করতে হবে, যেগুলি জলে গলে গিয়ে সেই অবস্থাতেই থাকে। সর্বশেষে অতি সামান্য মাত্রায় লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, বোরোন, দস্তা প্রভৃতি দিতে হবে। কোন্ কোন্ পদার্থ কোন্ কোন্ মাত্রায় দিতে হবে নীচে তার একটা তালিকা দিলাম। এ থেকে তোমাদের সলিউসন তৈরি করে নিতে হবে। গাছের পক্ষে প্রয়োজনীয় এই রাসায়নিক পদার্থগুলির মিশ্রণকে আমরা নিউট্রিয়েন্ট বা কালচার সলিউসন বলে উল্লেখ করব।

পরীক্ষার জন্যে ভিজা বালি বা ভিজা ব্লটিং পেপারের মধ্যে টোমাটোর বীজ রেখে প্রথমে চারা গাছ উৎপাদন করতে পারো। একটু বড় হয়ে উঠলে সেগুলিকে বালিভর্তি পাত্রের মধ্যে পুঁতে দিতে হবে। এতে নিয়মিতভাবে নিউট্রিয়েন্ট সলিউসন ঢেলে দিতে পারো অথবা সলিউসনের পাত্রটাকে উঁচুতে রেখে সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে ফোঁটা ফোঁটা করে অথবা ক্রমাগত প্রবাহিত করবার ব্যবস্থাও করতে পারো। যাতে গাছটা লাগাবে সেই বালির পাত্রটাকে একখানা এনামেল-করা থালা বা ট্রের উপর রাখলে ভালো হয়। কারণ বালির মধ্য দিয়ে গড়িয়ে অনেকটা সলিউসন তলায় গিয়ে সেই ট্রের মধ্যে জমা হবে এবং সেটাকে বার বার ব্যবহার করতে পারবে। ৫।৬ দিন পর পর নিউ-ট্রিয়েন্ট সলিউসন ব্যবহার করা দরকার। বালি-চাষে গাছের শিকড়-গুলি পাত্রের অনেকটা জায়গা জুড়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং বালির দানার ফাঁকে ফাঁকে যথেষ্ট বাতাসের সংস্পর্শেও আসতে পারে। কাজেই গাছগুলি যেমন আকারে বাড়ে তেমনি ফলপ্রসূ হয়। চাষের জন্যে মাঝারি দানার বালিই সুবিধাজনক। চালুনি দিয়ে ছেঁকে মাঝারি দানার বালি আলাদা করে নেওয়া যেতে পারে বালির দানা মোটা হলে তারা যথেষ্ট জল ও আহার্য পদার্থ ধরে রাখতে পারছে না; আবার বেশী সূক্ষ্ম দানাগুলি শিকড়ের গায়ে কাদামাটির

মত লেপটে বসে যায়। ফলে শিকড় যথাযথভাবে বাতাসের সংস্পর্শে আসতে পারে না।

বালি-চাষে Quartz sand অর্থাৎ বালুকা-প্রস্তর থেকে উৎপন্ন বালি ব্যবহার করাই সঙ্গত। প্রথমে পরিমাণ মত বালি ছেঁকে নিয়ে সেগুলিকে ২০০° ফাঃ বা আরও বেশী উত্তাপে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে গরম করে দেওয়া দরকার। ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করেও নেওয়া চলে।

জল-চাষের ব্যবস্থাও অনেকটা বালি-চাষের মত। তবে এই ব্যবস্থায় জলের পরিবর্তে খড়কুটা অথবা শুধু কালচার সলিউসনেই কাজ চলে। একটা পাত্রে কিছুটা নিউট্রিয়েন্ট বা কালচার সলিউসন রেখে সেটার উপর ছিদ্র-করা অথবা তারের জালের একটা ঢাক্‌না দিতে হয়। ঢাক্‌নার ছিদ্রের ভিতর দিয়ে তূলা অথবা কর্কের সাহায্যে গাছটাকে খাড়াভাবে রাখা দরকার। শিকড়গুলি কালচার সলিউসনের মধ্যে থাকবে। সলিউসনের মধ্য দিয়ে বুদ্‌বুদের আকারে শিকড়ের গায়ে বাতাস লাগবার ব্যবস্থা করতে হবে। অথবা গাছ সমেত ঢাক্‌নাটাকে মাঝে মাঝে তুলে নিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে শিকড়ের গায়ে বাতাস লাগানো দরকার।

এই সম্বন্ধে আর বেশী আলোচনা না করে এবার একরকম কালচার সলিউসন তৈরির কথা বলছি ঃ—

স্টক সলিউসন (ক)

আধ গ্যালন জলে এক চামচ বোরিক অ্যাসিড, ম্যাঙ্গানিজ সালফেট ও জিঙ্ক সালফেট একসঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে। প্রয়োজন মত পরে এই সলিউসনে $\frac{১}{৮}$ চামচ কপার সালফেটও মিশাতে পারো।

স্টক সলিউসন (খ)

এক পাঁইট জলে $\frac{১}{৪}$ চামচ আয়রণ (ফেরিক) ক্লোরাইড গুলে নিতে হবে।

কালচার সলিউসন

পরিমাণ	মনোপটাসিয়াম ফসফেট	ক্যালসিয়াম নাইট্রেট	ম্যাগ্নেসিয়াম সালফেট	অ্যামোনিয়াম সালফেট (শুষ্ক)
প্রতি ৫ গ্যালন সলিউসনে গ্রাম হিসাবে	৫·৯	২০·১	১০·৭	১·৮
প্রতি ৫ গ্যালন সলিউসন চামচ হিসাবে (মোটামুটি)	১¼	৪	২½	½

এর প্রত্যেকটি রাসায়নিক পদার্থ আলাদা আলাদাভাবে প্রায় তিন পোয়া জলে গুলে নিতে হবে। রাসায়নিক পদার্থগুলি দ্রবীভূত হয়ে গেলে তাদের একত্রে মিশিয়ে ফেলো। এই মিশ্রণে জল মিশিয়ে পাঁচ গ্যালন পর্যন্ত করতে হবে।

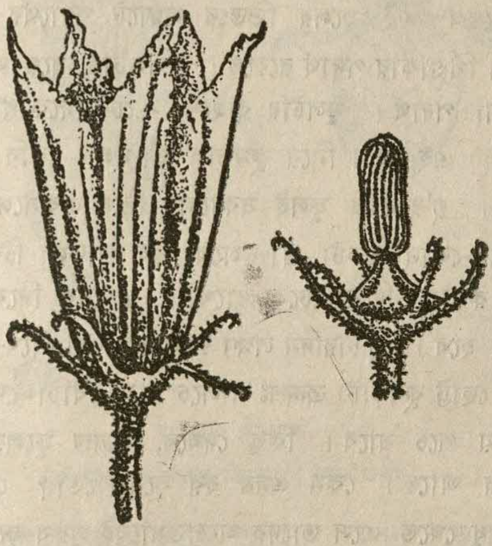
প্রতি গ্যালন কালচার সলিউসনে (বিশুদ্ধ রাসায়নিক থেকে প্রস্তুত হলে) ২ চামচ স্টক সলিউসন (ক) মিশিয়ে নাও।

যখন ব্যবহার করবে ঠিক সেই সময়ে স্টক সলিউসন (খ) কালচার সলিউসনের সঙ্গে মিশাতে হবে। এক গ্যালন কালচার সলিউসনে ৪ চামচ স্টক সলিউসন (খ) মিশিয়ে দেবে।

গাছে ইচ্ছামত ফল ধরানো

এবার তোমাদিগকে উদ্ভিদের বিষয়ে একটা পরীক্ষার কথা বলব। গাছে ফুল ফোটে কেন বলতে পার? ফুল ফোটে ফল ধরবার জন্যে। কেমন করে ফল ধরে, সে কথা বলছি। প্রাণীদের মত উদ্ভিদের মধ্যেও স্ত্রী, পুরুষ ভেদ আছে। কতকগুলি উদ্ভিদের মধ্যে স্ত্রী আর পুরুষ গাছ সম্পূর্ণ আলাদা। এদের কেবল স্ত্রী-গাছেই ফল ধরে। তাল পেঁপে প্রভৃতি গাছ এই রকমের। কতকগুলি

উদ্ভিদের স্ত্রী, পুরুষ পার্থক্য কেবল ফুলের মধ্যেই দেখা যায়। যেমন—লাউ, কুমড়া, শশা প্রভৃতি। আবার কতকগুলি গাছের একই ফুলের মধ্যে স্ত্রী, পুরুষ পার্থক্য আত্মপ্রকাশ করে। যেমন আম, জাম, বেগুন ইত্যাদি। কোন্‌টা স্ত্রী-ফুল আর কোন্‌টাই বা পুরুষ-ফুল কেমন করে জানা যাবে? যে পদার্থ টাকে ফুলের রেণু বলা হয়, তোমাদের প্রত্যেকেই বোধ হয় সেটা চেন। স্ত্রী এবং পুরুষ আলাদা ফুলের যেটার মধ্যে রেণু দেখবে, সেটাই হচ্ছে পুরুষ-ফুল। আর যেসব গাছে একই ফুলের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ পার্থক্য আত্মপ্রকাশ করে তার যে অংশটুকুতে রেণু থাকে সেটুকু পুরুষ, আর যে অংশে

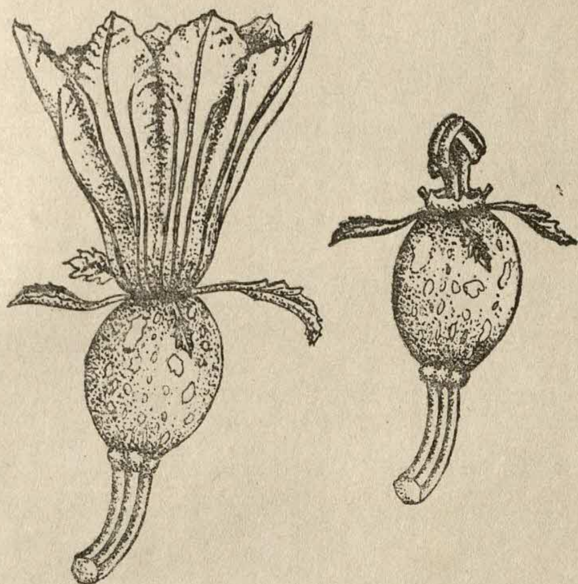


কুমড়ার পুরুষ-ফুল
ডানদিকে—ফুলের ভিতরের পুং কেশর

শোয়ার মত জিনিস অথবা কোন আঠালো পদার্থ থাকে, সেটুকু হলো স্ত্রী অংশ। পুরুষ অংশের রেণু স্ত্রী অংশে লেগে গেলে গাছ ফলবতী হয়। নচেৎ প্রথমে ছোট্ট ফল দেখলেও পরে সেটা নষ্ট হয়ে যায় অথবা বোঁটা থেকে খসে পড়ে।

এবার পরীক্ষার কথা বলছি। পরীক্ষা করতে হলে সহজে চেনা যায়, এরকমের সহজলভ্য কোন বড় ফুলের গাছ নেওয়াই স্থবিধা। কুমড়ার ফুলই প্রথম পরীক্ষার জন্যে বিশেষ উপযোগী। কিছুদূর লতিয়ে যাবার পর কুমড়া-লতার গাঁটে গাঁটে বড় বড় ফুল ফুটতে থাকে। কতকগুলি ফুলের বোঁটা খুবই লম্বা। সেই লম্বা বোঁটা-ওয়ালা ফুলের ভিতর দেখবে—হল্‌দে রঙের স্থূলকায় অথচ লম্বাটে একটা পদার্থ। সেটার গায়ে আঙুল লাগালেই আঙুলের সঙ্গে হল্‌দে গুঁড়ার মত পদার্থ লেগে যাবে। সেগুলিই পুরুষ ফুলের রেণু। গাছটার আরও কয়েক গাঁট দূরে দেখবে—খুব ডগ্‌মগে অন্য রকমের ফুল ফুটে আছে। এই ফুলের ভিতরে লম্বাটে পদার্থের পরিবর্তে দেখবে, একটা পিণ্ডাকার পদার্থ রয়েছে। পিণ্ডটার গায়ে থাকে এক রকম আঠালো পদার্থ। ফুলটার বাইরে, নীচের দিকে থাকে ছোট্ট একটা কুমড়া। এই সবটা নিয়ে কুমড়ার স্ত্রী-ফুল। ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে। তু'রকমের ফুলই সকালের দিকে একসঙ্গে ফোটে। ফোটবামাত্র যে-কোন একটা স্ত্রী-ফুলকে খুব পাতলা টিস্থ কাগজ বা রেশমী রুমাল দিয়ে ঢেকে রাখো। তুপুরের দিকে ঢাক্‌না সরিয়ে নিলেই হবে। তু-চারদিন লক্ষ্য রাখলেই দেখা যাবে—রুমাল-ঢাকা ফুলটার ছোট্ট কুমড়াটা ক্রমশঃ লালচে হয়ে বোঁটা থেকে খসে পড়বে, না হয় পচে যাবে। কিন্তু দেখবে, অন্যান্য ফুলের বোঁটায় বেশ ফল ধরে আছে। কেন এমন হয় বুঝেছ তো? মৌমাছিরা ওই ফুলের মধু খেতে এসে তাদের অজ্ঞাতসারেই পুরুষ-ফুলের রেণু-গুলিকে স্ত্রী-ফুলের আঠালো পদার্থটার গায়ে লাগিয়ে দিয়ে যায়। তাতেই ফলটা ক্রমশঃ পরিপুষ্ট ও বড় হয়ে ওঠে। রেণু না লাগলে স্ত্রী-ফুলটার সঙ্গে যে ছোট্ট ফলটা থাকে (চিত্র দেখো) সেটা বাড়তে পারে না। গাছে অজস্র ফুল ফুটলেও অনেক সময় মেঘ, বৃষ্টি, কুয়াশা প্রভৃতি খারাপ আবহাওয়া এবং অন্যান্য কারণে স্ত্রী-ফুলে রেণু লাগা সম্ভব হয় না। কাজেই ফল ধরতে পারে না। গাছ বাড়ন্ত

এবং ফুলও অজস্র, এরূপ ক্ষেত্রে ফল ফলতে না দেখলে পাখীর পালক বা নরম তুলি দিয়ে রেণু তুলে এনে অথবা পুরুষ-ফুলের বোঁটা ছিঁড়ে নিয়ে স্ত্রী-ফুলের পিণ্ডাকার পদার্থটার গায়ে রেণু লাগিয়ে দিলে দেখবে, প্রত্যেকটা ফুল থেকেই ফল বেড়ে উঠছে। খুব সাবধানে আল্‌তোভাবে রেণু লাগাতে হবে। কয়েকদিন চেষ্টা করলেই এই



কুমড়ার স্ত্রী-ফুল

ডানদিকে—ফুলের ভিতরের গর্ভ-কেশর

কাজে বেশ দক্ষতা লাভ করতে পারবে। ফসল বাড়ানো, উন্নত ধরনের ফসল উৎপাদন এবং আরও অনেক ব্যাপারে এর প্রয়োজনীয়তা অসাধারণ। যখন এই ব্যাপারে অন্ততঃ কিছুটাও সাফল্য লাভ করবে, তখন কৃষিবিজ্ঞান সম্বন্ধে তোমাদের উৎসাহ ক্রমেই বেড়ে উঠবে।

করে দেখ

তৃতীয় খণ্ড

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়
শ্রীমতী লীলা রায়

সূচীপত্র

চিনির দানায় আগুন জ্বালাবার কৌশল

কোন কোন পদার্থের উপস্থিতিতে কতকগুলি রাসায়নিক বিক্রিয়া ত্বরান্বিত বা সহজে নিষ্পন্ন হয়, অথচ বিক্রিয়ার ফলে সেই পদার্থটির কোনই পরিবর্তন ঘটে না। রসায়ন শাস্ত্রে এরূপ পদার্থকে ক্যাটালিষ্ট (catalyst) বা অনুঘটক বলা হয়ে থাকে। ক্যাটালিষ্টের এই অদ্ভুত কার্যকারিতার বিষয় খুব সহজ একটি পরীক্ষা করে দেখতে পার। এই পরীক্ষার জন্যে দরকার হবে দেশলাই, সামান্য কিছু সিগার বা সিগারেটের ছাই এবং বড় রকমের একটি চিনির দানা। আজকাল সচরাচর আমরা সরু বা মোটা দানার চিনি ব্যবহার করে থাকি ; কিন্তু সেগুলি ছাড়াও চিনির বেশ বড় বড় চৌকা দানা পাওয়া যায়।

এই রকমের বড় চিনির দানা সংগ্রহ করে একটা দানা একখানা প্লেটের উপর রেখে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে তাতে আগুন ধরাতে পার কি না—চেষ্টা করে দেখ। কিন্তু যতই চেষ্টা কর না কেন, কিছুতেই সেটাতে আগুন জ্বালাতে পারবে না।



এবার চিনির দানাটার একদিকে একটু সিগারেটের ছাই ঘষে দাও। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে এবার ছাই-ঘষা দিকটাতে লাগালেই দেখবে, দানাটাতে আগুন ধরে গেছে এবং সেটা বেশ সহজভাবেই জ্বলতে সুরু করেছে।

এ থেকে সহজেই বুঝতে পারা যায়, ছাইটা এখানে ক্যাটালিষ্ট বা অনুঘটকের কাজ করছে। ছাইটা-ই চিনির দানার প্রজ্বলনে সহায়তা করেছে। ছাই কিন্তু নিজে প্রজ্বলনক্ষম নয় এবং দহন কালেও সেটা সম্পূর্ণ অপরিবর্তিতই থেকে যায়।



ঝুলন্ত চাউল

তোমরা অনেকেই হয়তো যাত্নকর বা বেদেদের ম্যাজিকের খেলা দেখেছ। এই যাত্নকরেরা সময় সময় এমন সব অদ্ভুত খেলা দেখায়, সাধারণ বুদ্ধিতে যার কোন ব্যাখ্যাই খুঁজে পাওয়া যায় না।

এই রকম একটা খেলার কথা বলছি। পেট-মোটা, চওড়া মুখওয়ালা একটা গোলাকার পাত্রের কানায় কানায় চাউল ভর্তি করে যাত্নকরের সামনে রাখা হলো।

যাত্নকর তার ঝোলার ভিতর থেকে বেশ চকচকে একখানা ছোরা বের করে সেটাকে খাড়াভাবে চাউলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে আবার বের করে নিল। কিছুক্ষণ এরকম করবার পর ছোরাটাকে তুলে এনে সবাইকে দেখিয়ে গেল। তারপর লেড়কালোক এক দফে হাততালি লাগাও, ভানুমতীকা খেল দেখো—বলেই ছোরাটাকে আবার সেই চাউলের মধ্যে ঢুকিয়ে ছোরার বাঁটটা ধরে উঁচুতে তুললো। অবাক কাণ্ড! ছোরার সঙ্গে চাউল ভর্তি পাত্রটাও উঁচুতে ঝুলে রইলো।

কেমন করে সেটা সম্ভব হলো? ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললে তোমরাও এটা করে দেখতে পার। একটা শক্ত কাচের জার যোগাড় কর। জারের পেটের দিকটা যেন তার মুখের চেয়ে বেশ মোটা অর্থাৎ চওড়া হয়। জারটার কানায় কানায় চাউল ভর্তি কর এবং

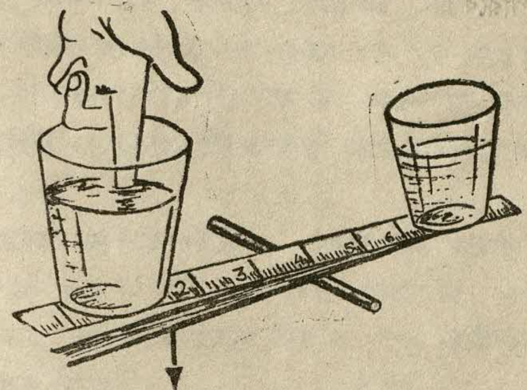
বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে চেপে চেপে বেশ করে বসিয়ে দাও। এবার একখানা ছোরা নিয়ে সেটাকে বেশ একটু জোর দিয়ে সোজাসুজিভাবে চাউলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে আবার তুলে আন। কিছুক্ষণ ধরে বার বার এই রকম করলেই দেখবে, জারের মধ্যে চাউলগুলি যেন শক্তভাবে পরস্পরের গায়ে এঁটে গেছে। তখন ছোরাটাকে আবার বেশ জোরের সঙ্গে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দাও। এবার ছোরার বাঁট ধরে উপরে তুললেই দেখবে—ফলমূল, কাঠ ইত্যাদি নমনীয় শক্ত পদার্থের মধ্যে জোর করে ছোরা ঢুকিয়ে দিলে যেমন হয়, ঠিক তেমনি ভাবেই চাউলের জারটা ছোরার সঙ্গে আট্‌কে ঝুলে আছে।



এটা কেমন করে সম্ভব হয়? একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে। ছোরাটাকে বেশ জোরের সঙ্গে বার বার চাউলের মধ্যে ঢোকাবার ফলে চাউলগুলি পরস্পর ঠাসাঠাসি করে পাত্রটার গায়ে বেশ শক্তভাবে চেপে বসে। এই অবস্থায় জোর করে ছোরাটাকে চাউলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে পাত্র সমেত চাউলগুলি একটা শক্ত পদার্থের মত ছোরাটার গায়ে এঁটে থাকবে।

গ্লাসের জলে আঙ্গুল ডোবালে তার ওজন কি বাড়ে ?

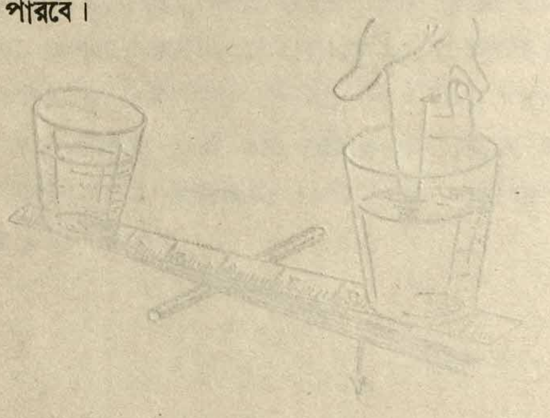
জল সমেত একটা গ্লাস ওজন করে নেবার পর তাতে ছোট্ট একটা মাছ ছেড়ে দিয়ে পুনরায় ওজন করলে কি দেখা যাবে ? তার ওজন বাড়বে, না সমানই থাকবে ? এই প্রশ্নটা নিয়ে অনেক সময় বিতর্কের সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু প্রশ্নটার উত্তর হলো, মাছটার ওজন যতটা গ্লাসের জলের ওজন ঠিক ততটা বেড়ে যাবে।



ধর একগ্লাস জলে তুমি একটা আঙ্গুল খানিকটা ডুবিয়ে দিলে অনেকেই বলবে, এতে ওজন কিছুই বাড়বে না। প্রকৃতপক্ষে ওজন কিছুটা বেড়েই যাবে। আঙ্গুল ডুবিয়ে দেবার ফলে যতটা জল স্থানচ্যুত হবে, তার ওজন যতটা, গ্লাসের জলের ওজন ঠিক ততটাই

বেড়ে যাবে। ব্যাপারটা খুব সহজেই তোমরা পরীক্ষা করে দেখতে পার।

টেবিলের উপর একটা পেন্সিল রাখ। পেন্সিলটার উপর আড়া-আড়িভাবে একখানা চ্যাপ্টা স্কেল বা রুলার রেখে তার দুই প্রান্তে একই রকমের দুটি জল ভর্তি গ্লাস ব্যালান্স করে বসিয়ে দাও। গ্লাস বসানো স্কেল খানাকে পেন্সিলের উপর এমনভাবে ব্যালান্স করে বসাবে, তার একটা প্রান্ত যেন সামান্য একটু নীচের দিকে হেলানো থাকে। যে গ্লাসটা একটু উঁচুতে আছে এবার তার মধ্যে খুব সাবধানে আঙ্গুলের ডগাটা খানিকটা ডুবিয়ে দাও। লক্ষ্য রাখবে—জল ছাড়া অন্য কোথাও যেন আঙ্গুল স্পর্শ না করে। দেখবে আঙ্গুলটা ডুবিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই স্কেলের অপর দিকের গ্লাসটা একটু উপরে উঠে গিয়ে দুদিকেই প্রায় সমানভাবে ব্যালান্স হয়েছে। আঙ্গুল ডুবিয়ে দেবার ফলে গ্লাসের জলের ওজন যে বেড়ে গেছে, এই পরীক্ষাতে সে কথাই প্রমাণিত হয়। কিভাবে পরীক্ষাটা করতে হবে, ছবিটা দেখলেই সহজে বুঝতে পারবে।



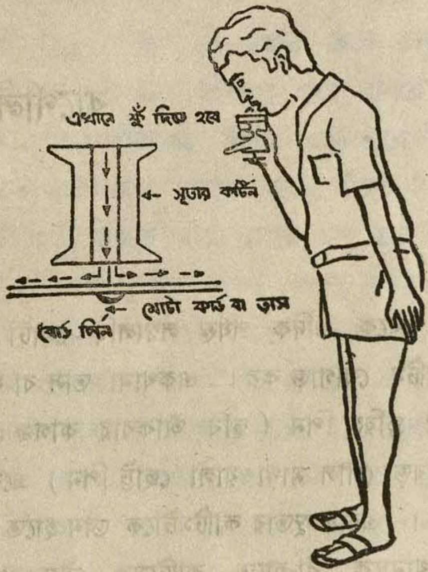
বার্ণৌলীর সূত্র

মাঝখানে এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত লম্বালম্বি মোটা ছিদ্রওয়ালা একটা সূতার কাটিম যোগাড় কর। একখানা তাস বা শক্ত কার্ডের মাঝামাঝি একটা ড্রয়িং পিন (ছবি আঁকবার কাগজ বোর্ডে এঁটে দেবার জন্যে বেশ বড় গোল মাথাওয়ালা ছোট্ট পিন) এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফুটিয়ে দাও। এবার সূতার কাটিমটাকে ডান হাতে ধর। পিন ফোটানো কার্ডখানাকে বাঁ-হাতে কাটিমের নীচে ধর। এবার কাটিমটার উপরে ছিদ্রের মুখে যত জোরে পার মুখ দিয়ে ফুঁ দাও। ফুঁ দেবার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য বাঁ-হাতে ধরা কার্ডখানাকে ছেড়ে দিতে হবে। ছবিটা দেখে নাও, কি ভাবে ফুঁ দিতে হবে সহজেই বুঝতে পারবে।

তোমাদের মনে হতে পারে, ফুঁ দেবার সঙ্গে সঙ্গেই কার্ডখানা মাটিতে পড়ে যাবে। কিন্তু করে দেখ, তা হবে না। যতক্ষণ ফুঁ দেওয়া চলবে, ততক্ষণ কার্ডখানা নীচে না পড়ে কাটিমটার সঙ্গেই লেগে থাকতে চাইবে।

ফুঁ দিলে কার্ডখানা নীচে না পড়ে উপরের দিকে লেগে থাকতে চায় কেন—এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় বার্ণৌলীর সূত্রে (অষ্টাদশ শতাব্দীর সুইস বিজ্ঞানী ড্যানিয়েল বার্ণৌলীর নামানুসারে এই সূত্রটির নাম দেওয়া হয়েছে)। এই সূত্রে বলা হয়েছে—যখন কোন বায়বীয়

অথবা তরল পদার্থ গতিশীল অবস্থায় থাকে, তখন তার চাপ কমে যায়। গতিবেগ যত বৃদ্ধি পায়, চাপও তত বেশী কমতে থাকে।



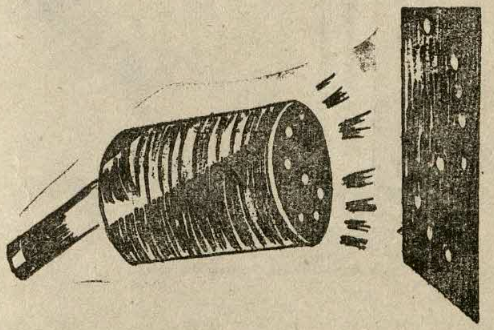
কাটিমের ছিদ্রের ভিতর দিয়ে দিলে কার্ডখানার উপর দিয়ে বাতাস খুব জোরে বইতে থাকে। এর ফলে কার্ডের উপরের দিকের বাতাসের চাপ অনেক কমে যায়। কাজেই কার্ডের নীচের দিকের বাতাসের চাপ উপরের চেয়ে বেশী হবার দরুণ কার্ডখানা পড়ে যায় না।

এরোপ্লেন ওড়বার সময় ঠিক এরূপ ব্যাপারই ঘটে। এরোপ্লেনের ডানা দুটি এমন ভাবে তৈরী যে, ওড়বার সময় ডানার উপরের দিকের বাতাস নীচের দিকের বাতাসের চেয়ে অনেক দ্রুততর বেগে ছুটতে থাকে। কাজেই ডানার নীচের দিকের চেয়ে উপরের দিকে বাতাসের চাপ অনেক কমে যায়। এর ফলে ডানার নীচের দিকের বেশী চাপের বাতাস ভারী প্লেনকে পড়ে যেতে দেয় না।

টিনের চোঙের প্ল্যানেটেরিয়াম

ঘরের দেয়াল বা সিলিং-এর উপর আলোকপাত করে প্লানেটেরিয়ামের মত অতি সুন্দরভাবে নক্ষত্রমণ্ডলের ছবি দেখানো যেতে পারে। খুব সহজেই এই ব্যবস্থা করা যায়।

রাতের আকাশে তোমরা হয়তো কালপুরুষ, সপ্তর্ষি প্রভৃতি নানারকম নক্ষত্রমণ্ডল দেখে থাকবে। এই সব নক্ষত্রমণ্ডলের ছবি অনেক বইতে দেখতে পাবে। তা থেকে যে কোন একটা নক্ষত্রমণ্ডলের ছবি



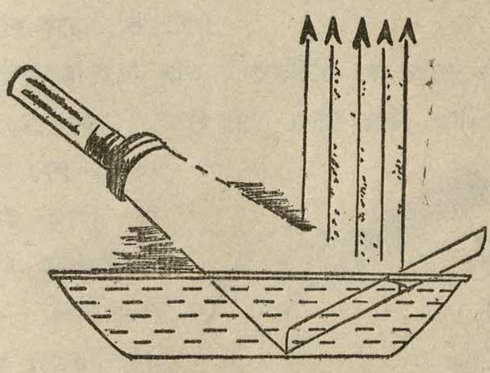
পাত্‌লা কাগজে কপি করে নাও। এবার কার্ডবোর্ড বা টিনের তৈরী একটা মগ যোগাড় কর। মগের তলার দিকটায় ঐ ছবি আঁকা কাগজখানা উল্টো করে লাগিয়ে দাও। কাগজখানা উল্টো করে লাগালেও আঁকা চিহ্নগুলি পরিষ্কার দেখা যাবে। তারপর পাঞ্চের সাহায্যে প্রত্যেকটি তারকা-চিহ্নের দাগে দাগে গর্ত করে দাও।

আলোকপাত করলে ঐ গর্তগুলিই দর্পণে প্রতিফলিত চিত্রের মত দেয়ালের গায়ে নক্ষত্রমণ্ডলের সজ্জার আলোক-চিহ্ন ফুটিয়ে তুলবে।

এবার ছিদ্র-করা টিনের মগটিকে অন্ধকার ঘরে নিয়ে গিয়ে তার খোলা মুখের ভিতর দিয়ে একটি টর্চ জ্বালিয়ে দাও। টর্চটাকে একটু হেলানো ভাবে ধরতে হবে, যাতে আলোকরশ্মি গর্তগুলির ঠিক বরাবর না পড়ে চোঙের ভিতরের দেয়ালের গায়ে পড়ে। এর ফলে গর্তের ভিতর দিয়ে নক্ষত্রমণ্ডলের পরিবর্ধিত চিত্র ঠিক স্বাভাবিক ছবির মতই দেয়ালের গায়ে পড়বে। চোঙটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিভিন্ন অবস্থানে নক্ষত্রমণ্ডলটিকে কিরূপ দেখায় তা সহজেই বুঝতে পারবে।

আয়নার সাহায্যে আলোর বর্ণছত্র উৎপাদন

প্রিজম্ অর্থাৎ ত্রিকোণ-কাচের ভিতর দিয়ে সূর্যরশ্মি প্রেরণ করলে রামধনুর রং দেখা যায়—নিউটনের এই বিখ্যাত পরীক্ষার কথা তোমাদের প্রত্যেকেরই হয়তো জানা আছে। কিন্তু ত্রিকোণ-কাচ সংগ্রহ করা তোমাদের অনেকের পক্ষেই বোধ হয় সম্ভব হবে না।



কাজেই তোমরা যদি এই পরীক্ষাটা করে দেখতে ইচ্ছা কর, তাহলে সাধারণ একখানা মুখ-দেখা আয়নার সাহায্যেও অনায়াসে এরূপ বর্ণছত্র উৎপাদন করতে পার। এর জন্যে দরকার হবে একটা টর্চ, মুখ দেখবার একটা ছোট্ট আয়না। আয়নাটার বেশ খানিকটা অংশ পাত্রের জলের মধ্যে কাৎভাবে ডুবিয়ে পাত্রের কানার গায়ে ঠেস দিয়ে

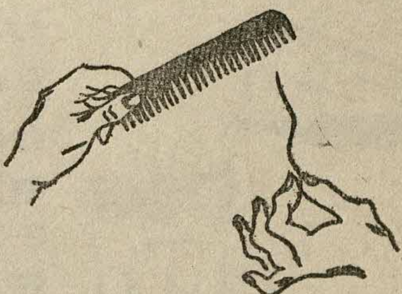
রাখ। পাত্রের জলের উপরিতল থেকে আয়নাটি যেন প্রায় ৩০ ডিগ্রি হেলানো ভাবে থাকে। এবার দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘরটাকে অন্ধকার করে দিয়ে টর্চটা জ্বেলে আয়নার জল-নিমজ্জিত অংশের উপর আলো ফেললেই দেখবে উপরে সিলিং-এর গায়ে রামধনু রঙের বর্ণছত্র ফুটে উঠেছে।

এই পরীক্ষায় দেখা যাবে—সাদা আলো বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিভিন্ন বর্ণের আলোর সমবায়ে উদ্ভূত। জলটাই ত্রিকোণ-কাচের মত বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোককে বিভিন্ন কোণে প্রতিসরিত করে বর্ণছত্র উৎপাদন করে।

স্থির বিদ্যুতের খেলা

আমাদের দেশের যাদুকরদের বিখ্যাত দড়ির খেলার কথা তোমরা অনেকেই হয়তো শুনে থাকবে। দড়ির খেলাটা যাই হোক না কেন, তোমরা কিন্তু অনায়াসে এই রকমের একটা ছোট্ট খেলা দেখিয়ে সবাইকে অবাক করে দিতে পার।

ছোট্ট একটুক্‌রা সূতা নাও। সূতাটার এক প্রান্ত এক হাতের দুই আঙ্গুলে চেপে ধর। অপর হাতে ছোট্ট একটা প্লাষ্টিকের চিরুণী নিয়ে সেটাকে বেশ কয়েকবার তোমার জামা বা কাপড়ে খুব দ্রুতগতিতে ঘষে নাও। চিরুণীটাকে এবার অপর হাতে ধরা সূতার মুক্ত প্রান্তের কাছে নিয়ে গেলেই দেখবে—



সূতাটা চিরুণী দিকে খাড়া হয়ে উঠবে। চিরুণীটাকে সূতাটার চারদিকে বৃত্তাকারে ঘোরালে সূতার মাথাটাও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে থাকবে।

স্থির-বিদ্যুতের জন্যেই এরকম ব্যাপার ঘটে। ঘর্ষণের ফলে কাপড় বা জামার মুক্ত ইলেকট্রনগুলি বেরিয়ে এসে চিরুণীর গায়ে জমা হয়

এবং চিরুণীটা ঋণ-তড়িতাধানযুক্ত হয়ে পড়ে। সূতাটা ঠিক যেন ইলেকট্রোস্কোপের মত কাজ করে। মুক্ত ইলেকট্রনগুলি সূতা থেকে প্রত্যাহত হয় এবং সূতাটা ধন-তড়িতাধানযুক্ত হয়ে থাকে। বিপরীত তড়িতাধানের প্রতি আকর্ষণের ফলে সূতাটা ঋণ-তড়িতাহিত চিরুণীর দিকে আকৃষ্ট হয়।

শীতকালে শুষ্ক আবহাওয়াতেই এই খেলাটি সুন্দরভাবে দেখানো যায়। জল বিদ্যুৎ-পরিবাহক—কাজেই বর্ষার আর্দ্র আবহাওয়ার জলীয় বাষ্পের মাধ্যমে তড়িৎ-পরিবাহিত হয়ে যাবার ফলে খেলাটা ভাল রকমে দেখানো যায় না।

ভাসমান কর্কের খেলা

একটা কাচের গ্লাসের কানার সমান জল ভর্তি করে তাতে ছোট একটা কর্ক্ ছেড়ে দাও। দেখবে কর্ক্টা গ্লাসের এক পাশে লেগে ভেসে আছে। বন্ধুদের বল গ্লাসের কোন দিক স্পর্শ না করে তাদের মধ্যে কেউ জলের ঠিক মাঝখানটায় কর্ক্টাকে ভাসিয়ে রাখতে পারে কি না। কিন্তু তারা যতই চেষ্টা করুক না কেন, কেউ সেটাকে জলের মধ্যস্থলে ভাসিয়ে রাখতে পারবে না।

সবাই যখন অকৃতকার্য হবে, তখন তুমি তাদের দেখিয়ে দিতে পার, কত সহজে এই কাজটা করা যেতে পারে। অন্য একটা গ্লাস থেকে ঐ গ্লাসটার মধ্যে খুব সতর্কভাবে আস্তে আস্তে আর একটু জল ঢেলে দাও, যেন জলটা উপ্‌চে না পড়ে—কানা থেকে সামান্য একটু উঁচু হয়ে থাকে। তলটানের (surface tension) ফলে জলের উপরি ভাগ কুব্জপৃষ্ঠের মত উপরের দিকে ঈষৎ বেঁকে থাকবে। কর্ক্টা তখন আপনা থেকেই গ্লাসের জলের সর্বোচ্চ স্থানে অর্থাৎ ঠিক মধ্য স্থলে গিয়ে স্থির হয়ে থাকবে।



জটিল সমস্যা

প্রায় আড়াই ফুট বা তিন ফুট লম্বা সরু এক গাছা দড়ি টেবিলের উপর রেখে তোমার বন্ধুদের জিজ্ঞাসা কর, তাদের মধ্যে কেউ সেই দড়িটার দুই প্রান্ত দুই হাতে ধরে কোন প্রান্ত থেকে হাতের মুঠো না খুলে দড়িটার মধ্যে একটা গেরো দিতে পারে কি না।

দড়িটার দুই প্রান্ত দুই হাতে ধরে রেখে মধ্যস্থলে একটা গেরো দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব বলে মনে হলেও খুব একটা সহজ কৌশলেই কিন্তু কাজটা করা যায়।



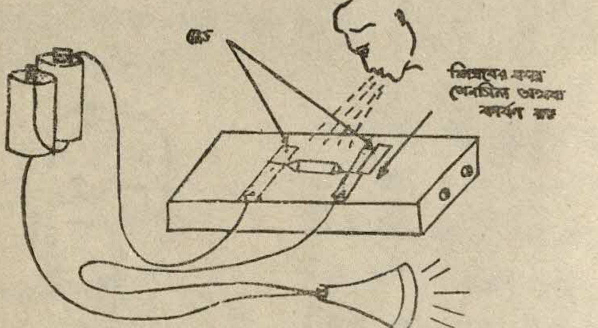
কৌশলটা হচ্ছে—প্রথমে তোমার হাত দুটি মুড়ে ডান হাতখানা বাঁ-হাতের বাহুর উপরে রাখ এবং বাঁ-হাতখানা ডান-হাতের উপর দিয়ে ডান বাহুর নীচে চালিয়ে দাও। এবার টেবিলের উপর রাখা দড়িটার দুই প্রান্ত দুই হাত দিয়ে ধর। এখন হাত দুইটির ভাঁজ ছেড়ে দিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় আনলেই দেখবে, দড়িটার মাঝখানে

একটা গেরো পড়ে গেছে। ছবিটা লক্ষ্য করলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। ডান হাত বাঁ-হাতের উপর না রেখে বাঁ-হাত ডান হাতের উপর এবং ডান হাত বাঁ হাতের উপর দিয়ে বাম বাহুর তলায় নিয়ে দড়িটার দুই প্রান্ত ধরে হাত খুলে নিলেই দড়িতে উল্টো মোচড়ের গেরো পড়বে।

সহজ ব্যবস্থায় টেলিফোন

তোমরা যদি এক ঘর থেকে আর এক ঘরে অথবা কাছাকাছি এক বাড়ী থেকে আর এক বাড়ীতে বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে চাও, তাহলে সহজ উপায়ে একরকম টেলিফোন তৈরী করে নিতে পার।

এই রকমের টেলিফোন তৈরী করতে হলে কয়েকটি জিনিষ যোগাড় করে নিতে হবে; যথা—খালি একটা সিগারেটের বাক্স, দাড়ি কামাবার দুখানা ব্লেড, দুটি ড্রাই সেল (টর্চের ব্যাটারী), প্রায় ২ ইঞ্চি লম্বা একটা উড পেন্সিল এবং কানে দিয়ে শোনবার জন্যে একটা



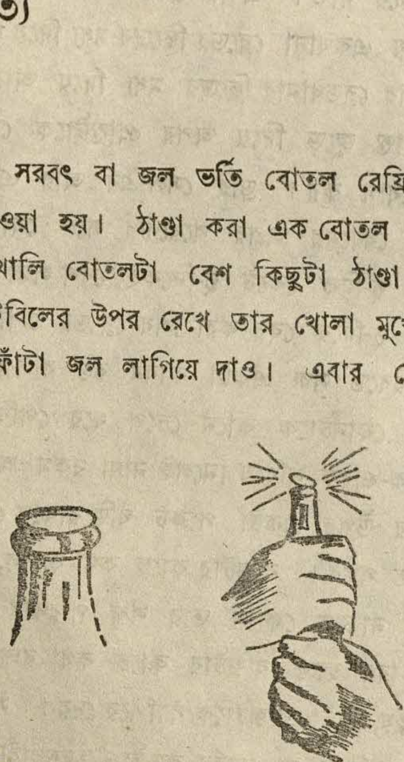
ফোন। পুরনো বাতিল মালের দোকান থেকে এই রকম একটা ফোন অনায়াসেই সংগ্রহ করতে পারবে। এছাড়া দরকার হবে প্রয়োজনমত কয়েক গজ সরু ইলেকট্রিক তারের।

জিনিসগুলি যোগাড় করবার পর বাক্সটার উপরের দিকে ছুরি দিয়ে প্রায় দেড় ইঞ্চি তফাতে সমান্তরালভাবে ব্লেডের লম্বা দিকের

সমান দুটি জায়গায় চিরে দাও। এই চেরা ফাঁকের মধ্যে ব্লেড দুখানা বেশ চেপে বসাতে হবে। চেরার মধ্যে ব্লেড দুখানা শক্তভাবে এঁটে না থাকলে সিলিং ওয়াক্স গরম করে চেরার ফাঁকে লাগিয়ে দাও। তারপর ব্লেড দুখানা গরম করে ঐ সিলিং ওয়াক্সের ভিতর দিয়ে চেপে বসিয়ে দিলেই শক্ত হয়ে এঁটে যাবে। তার দিয়ে ড্রাই সেল দুটাকে সিরিজে যোগ করে দাও। এবার ড্রাই সেল-এর এক প্রান্ত থেকে একটি তার নিয়ে একখানা ব্লেডের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে বেশ শক্ত করে জুড়ে দাও। অপর ব্লেডখানার ছিদ্রের মধ্য দিয়ে আর একটি লম্বা তারের এক প্রান্ত জুড়ে দিয়ে অপর প্রান্তটাকে ফোনের একটি পয়েন্টের সঙ্গে যোগ কর। ড্রাই সেল-এর আর এক প্রান্ত থেকে লম্বা তার নিয়ে ফোনের অপর পয়েন্টের সঙ্গে যোগ করে দাও। উড পেন্সিলটার দু-দিক কেটে দু-দিকেই বেশ লম্বা শিষ বের কর। এবার পেন্সিলের দু-দিকে বের করা শিষ ব্লেডের উপর বসিয়ে দাও। (পেন্সিলের পরিবর্তে সরু একটা কার্বন রড বসিয়ে দিলেও চলতে পারে)। এখন ফোনটাকে কানে চেপে ধরে পেন্সিলটাকে একটু উঁচু-নীচু বা এদিক-ওদিক সরিয়ে নিলেই নানা রকম আওয়াজ শুনতে পাবে। বাক্সটার উপর একটা পকেট ঘড়ি রাখলে বেশ জোরে টিক্ টিক্ শব্দ শুনতে পাবে। বাক্সটার কাছে কথা বললে, বাক্সটা ঘষলে বা টেবিলটাকে নাড়লে ফোনে তার শব্দ পরিষ্কার শুনতে পাওয়া যাবে। এর কারণ হচ্ছে বাক্সটার কাছে কথা বললে বাতাসে যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, সেটা বাক্সটাকে কাঁপিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ব্লেডের উপর স্থাপিত পেন্সিল বা কার্বন রড্টাও তদনুযায়ী কাঁপতে থাকে। ফলে ড্রাই সেল থেকে যে তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হয়, তার মধ্যেও একটা ওঠা-নামা চলে। এই তড়িৎ-স্রোত ফোনের ইলেকট্রো-ম্যাগ্নেটের মধ্য দিয়ে চলবার সময় ফোনের ভিতরের ডায়াফ্রামটাকে (পর্দাকে) অনুরূপ ভাবে কাঁপিয়ে শব্দ সৃষ্টি করে।

পয়সার নৃত্য

সোডাওয়াটার, সরবৎ বা জল ভর্তি বোতল রেফ্রিজারেটরে রেখে ঠাণ্ডা করে নেওয়া হয়। ঠাণ্ডা করা এক বোতল জল গ্লাসে ঢেলে নেবার পর খালি বোতলটা বেশ কিছুটা ঠাণ্ডা থাকে। খালি বোতলটাকে টেবিলের উপর রেখে তার খোলা মুখের উপর আঙুল দিয়ে দু-এক ফোঁটা জল লাগিয়ে দাও। এবার বোতলটার জল



লাগানো মুখের উপর একটা তামার পয়সা (পয়সা না পেলে ঐ রকমের একটা তামার বা পিতলের চাকৃতি হলেও চলবে) বসিয়ে দাও। পয়সাটা জলের সঙ্গে বোতলের মুখে এমনভাবে লেগে যাবে যে, কোথাও একটু ফাঁক থাকবে না।

এবার দু-হাত দিয়ে বোতলটাকে বেশ শক্ত করে চেপে ধরে থাক।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখবে পয়সাটা একটু একটু ওঠা নামা করছে এবং তার ফলে খুট্‌, খুট্‌, শব্দ হচ্ছে। এবার তোমার হাত সরিয়ে নিলেও দেখবে—তখনও পয়সাটার শব্দ সমানভাবেই চলছে। কেন এমন হয় সেটা সহজেই বুঝতে পারবে। গরম দিলে বাতাস যে প্রসারিত হয়, এটা তারই একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত। বোতলের মধ্যে যে ঠাণ্ডা বাতাস ছিল, হাতের গরমে সেটা প্রসারিত হয়ে বেরিয়ে যাবার দরুণই পয়সাটা ওঠা-নামা করে থাকে।

সূচ জলে ভাসাবার কৌশল

জল এবং অন্যান্য তরল পদার্থের তলটান (Surface tension) সম্পর্কিত সাধারণ একটা পরীক্ষার কথা বলছি। তোমরা অনেকেই হয়তো এই পরীক্ষাটা করে দেখেছ। তবুও সহজ ব্যবস্থায় কিভাবে করা যায়, সে কথাটাই জানিয়ে দিচ্ছি।

যে কোন তরল পদার্থের উপরিতলে সূক্ষ্ম একটা পর্দার মত



আস্তরণ থাকে। এই পর্দাটা তরল পদার্থের উপরিতলকে যেন বেশ জোর করে টেনে রাখে। একেই বলা হয় তলটান।

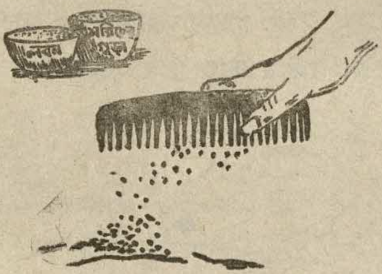
একটা সূচ বেশ ভাল করে শুকিয়ে নাও। তারপর ছবির মত

করে সূচটাকে একটা টেবিলের কাঁটার উপর রেখে জলভর্তি একটা পাত্রের মধ্যে কাঁটাটাকে ডুবিয়ে দাও। কাঁটাটা জলের নীচে যেতেই সূচটা জলের উপর ভেসে থাকবে। লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে, জলের উপরিতলটা যেন সূচটার ভারে খানিকটা নীচের দিকে বেঁকে গেছে। একটি ক্ষুরের ফলা দিয়েও ঠিক এরকমের পরীক্ষা করতে পার। খুব সতর্কতার সঙ্গে কাঁটাটাকে ডুবিয়ে দিতে পারলে প্রত্যেক বারেই সাফল্য লাভ করবে।

বিদ্যুতের খেলা

●

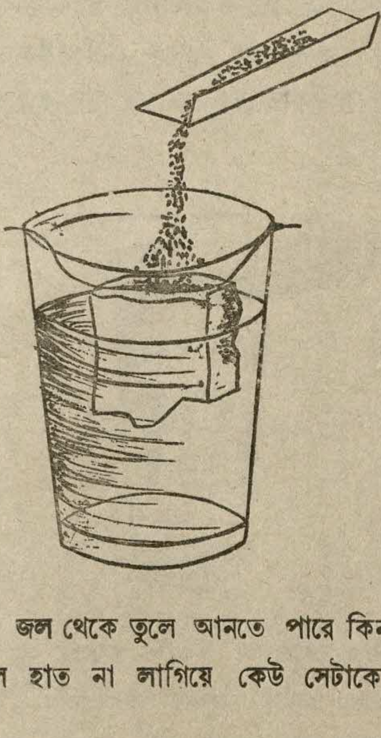
খুব সহজ উপায়ে বিদ্যুতের একটি খেলা দেখিয়ে তোমার বন্ধুদের অবাক করে দিতে পার। খাবার টেবিলের উপরেই খেলাটা থাতে পারবে। কিছু নুন নিয়ে টেবিলের উপর রাখ এবং আঙ্গু দিয়ে পাত্‌লা করে বেশ কিছুটা ছড়িয়ে দাও। সেই নুনের উপর ছুটা গোলমরিচের গুঁড়া ছড়িয়ে মিশিয়ে দাও। এবার বন্ধুদের বল াদের



মধ্যে কেউ কোন সহজ উপায়ে নুন থেকে মরিচের গুঁড়া পৃথক করে দিতে পারে কিনা। হাতে করে নুন থেকে মরিচের গুঁড়া পৃথক করা সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু একটা সহজ উপায়ে অনায়াসেই এই কাজটা করা যেতে পারে। আজকাল তোমাদের অনেকের পকেটেই চুল আঁচড়াবার ছোট্ট চিরুণী থাকে। এই রকমের চিরুণী দিয়ে বেশ কয়েকবার চুল আঁচড়ে নাও; তাহলেই চিরুণীটার মধ্যে স্থৈতিক বিদ্যুতের সঞ্চার হবে। চিরুণীটাকে এবার নুন ও মরিচের গুঁড়ার মিশ্রণের কিছুটা উপরে ধরলেই দেখবে, হাল্কা মরিচের গুঁড়াগুলি লাফিয়ে উঠে চিরুণীর গায়ে লেগে যাচ্ছে। এই খেলাটা শীতকালেই খুব সুন্দরভাবে দেখানো যায়।

হাত না লাগিয়ে বরফ-খণ্ড তোলবার উপায়

এক গ্লাস জলে এক খণ্ড বরফ ফেলে দিলে সেটা জলের মধ্যে ভেসে থাকবে। তোমার বন্ধুদের বল হাত দিয়ে স্পর্শ না করে তাদের

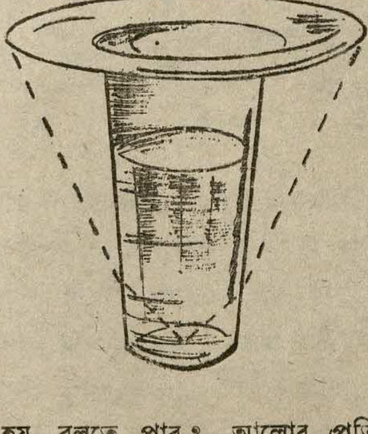


কেউ বরফ-খণ্ডকে জল থেকে তুলে আনতে পারে কিনা। কৌশলটা জানা না থাকলে হাত না লাগিয়ে কেউ সেটাকে তুলে আনতে পারবে না।

কৌশলটা খুবই সহজ। প্রায় ৪ ইঞ্চি লম্বা এক টুকরা সূতা নাও। ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনি করে সূতাটাকে বরফ-খণ্ডের উপর রেখে দাও। এবার খানিকটা নুন এনে ঐ জায়গাতে ছড়িয়ে দাও। নুন দিলেই সূতার চারদিকের বরফ গলতে সুরু করবে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকেই বরফ ওই জলের তাপ টেনে নেবে। ফলে সূতাটার চারদিকে জল পুনরায় জমতে সুরু করবে এবং ২/১ মিনিটের মধ্যেই বরফ-খণ্ডের সঙ্গে সূতাটা শক্তভাবে এঁটে যাবে। এবার সূতাটার যে কোন এক প্রান্ত ধরে টানলেই বরফ-খণ্ড সূতার সঙ্গে উঠে আসবে।

ডাকটিকেট অদৃশ্যকরণ

উপরের দিকে মুখ করে টেবিলের উপর একটি ডাকটিকেট রেখে তার উপরে একটা জলভর্তি কাচের গ্লাস বসিয়ে দাও। উপর থেকে জলের মধ্যে দিয়ে টিকেটটাকে দেখা যাবে। এবার ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, সেভাবে গ্লাসটার মুখে একখানা পিরিচ বসিয়ে দিলেই দেখবে, ডাকটিকেটটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। গ্লাসটার চারদিক দিয়ে যে কোন ভাবেই চেষ্টা কর না কেন, ডাকটিকেটটাকে আর দেখা যাবে না।



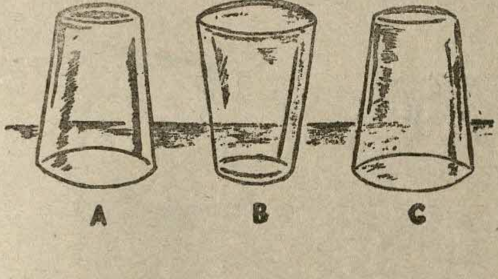
কেন এমন হয়, বলতে পার? আলোর প্রতিসরণের ফলেই এরূপ ব্যাপার ঘটে; অর্থাৎ এক রকমের মাধ্যম থেকে কৌণিকভাবে অন্য রকম মাধ্যমের ভিতর দিয়ে যাবার সময় আলোকরশ্মি বেঁকে

যায়। ছবিতে কাটা কাটা লাইনে দেখানো হয়েছে আলোকরশ্মি জলের মধ্য দিয়ে বাতাসের মধ্যে প্রবেশ করবার সময় কেমন করে উপরের দিকে বেঁকে গিয়ে গ্লাসের মুখে বসানো পিরিচখানার নীচের দিকটায় পড়েছে। প্রতিসরিত আলো পিরিচের তলার দিকটায় বাধাপ্রাপ্ত হবার ফলে গ্লাসের কোন দিক থেকেই ডাকটিকেটটাকে দেখা যয়ে না।

তিন গ্লাসের খেলা

তিনটি গ্লাসের সাহায্যে গাণিতিক কৌশলেব একটি খেলা দেখিয়ে তোমার বন্ধুদের অবাক করে দিতে পার।

টেবিলের উপর একসারে তিনটি খালি গ্লাস রাখ। মধ্যের গ্লাসটির মুখ থাকবে উপরের দিকে আর পাশের গ্লাস দুটিকে বসাবে উবুড় করে অর্থাৎ সে-দুটির মুখ থাকবে নীচের দিকে। ছবিটি দেখলেই বুঝতে



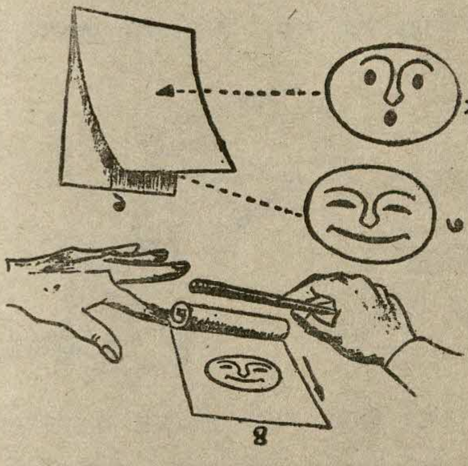
পারবে কেমন করে বসাতে হবে। এবার একসঙ্গে দু-হাতে দুটি করে গ্লাস তুলে নিয়ে উল্টো করে বসিয়ে ঠিক তিন বারে এমন অবস্থায় আনতে হবে, যাতে তিনটি গ্লাসের মুখই উপরের দিকে থাকে। কেমন করে করা যায় বলে দিচ্ছি। প্রথমে AB গ্লাস দুটিকে দু-হাতে ধরে এক সঙ্গে উল্টে বসিয়ে দাও। দ্বিতীয় বারে AC গ্লাস দুটিকে উল্টে বসাও। তৃতীয় বারে AB গ্লাস দুটিকে উল্টে বসালেই দেখবে তিনটি গ্লাসের মুখই উপরের দিকেই হয়েছে।

এবার কথা বলার ফাঁকে, অন্যের অলক্ষ্যে মাঝের গ্লাসটা নীচের দিকে মুখ করে বসিয়ে দাও এবং বন্ধুদের বল তাদের মধ্যে কেউ তোমার মত করে ঠিক তিনবারে একসঙ্গে দুটি করে গ্লাস উল্টে দিয়ে সবগুলি গ্লাসের মুখ উপরের দিকে আনতে পারে কি না।

তুমি প্রথম আরম্ভ করেছিলে দুটি গ্লাসের মুখ নীচের দিকে এবং একটি গ্লাসের মুখ উপরের দিকে রেখে। কিন্তু এবার সাজাবার ব্যবস্থার সামান্য পরিবর্তনের ফলে একসঙ্গে দুটি করে গ্লাস তিনবার বা যতবারই উল্টে দিক না কেন, কিছুতেই সবগুলি গ্লাসের মুখ একসঙ্গে উপরের দিকে আনতে পারবে না।

কাগজের চলচ্চিত্র

দৃষ্টিভ্রমের জন্য সিনেমার পর্দায় ছবিগুলিকে আমরা গতিশীল দেখে থাকি, একথা হয়তো তোমরা অনেকেই জান। ফিল্মের গায়ে মুদ্রিত বহুসংখ্যক স্থির ছবিকে অতি দ্রুতগতিতে পর পর পর্দার উপর ফেলে এরূপ দৃষ্টিভ্রমের সৃষ্টি করা হয়। কাগজের উপর আঁকা দুখানা ছবির সাহায্যে ব্যাপারটা তোমরা অনায়াসেই পরীক্ষা করে দেখতে পার।



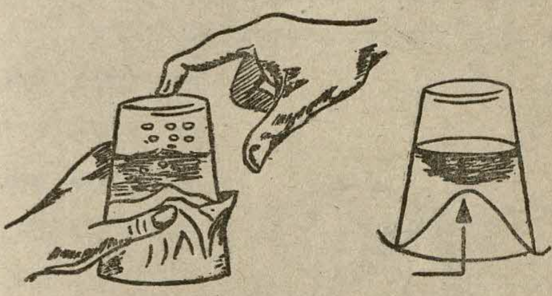
লম্বায় ৮ ইঞ্চি ও পাশে ৩ ইঞ্চি মাপের একটু মোটা ও শক্ত একখণ্ড কাগজ নিয়ে তাকে ১নং চিত্রের মত সমান দু-ভাঁজ কর।

উপরের কাগজখানাতে ২নং ছবির মত একটি এবং নীচের কাগজখানাতে ৩নং ছবির মত একটি ছবি এঁকে নাও। এবার উপরের ছবির কাগজখানাকে একটা পেন্সিলের গায়ে জড়িয়ে একটা চোঙের মত গুটিয়ে দিয়ে পেন্সিলটা খুলে নাও। পেন্সিলটা খুলে নিলেও কাগজখানা চোঙের মত গুটিয়ে থাকবে। এবার কাগজখানাকে টেবিলের উপর রেখে উপরের বাঁ-দিকের কোণে বাঁ-হাতের আঙ্গুলে চেপে ধরে ডান হাতে একটা পেন্সিলের সাহায্যে জড়ানো কাগজটাকে দ্রুতগতিতে একবার উপরের দিকে টানলে কাগজটার পাক খুলে যাবে। সঙ্গে সঙ্গেই আবার পেন্সিলটাকে নীচে থেকে উপরের দিকে টানলে কাগজটা পুনরায় জড়িয়ে যাবার ফলে ৩নং ছবিটাকে দেখা যাবে। পেন্সিলটাকে বেশ তাড়াতাড়ি উপরে-নীচে বোলাতে হবে। এর ফলে মনে হবে ছবির মুখখানা যেন একবার হাসছে, আবার গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। চলচ্চিত্রের মূল রহস্যটি এ থেকেই বুঝতে পারবে।

উত্তাপ না দিয়ে জল ফোটানো

তোমরা অনেকেই হয়তো বেদেদের যাত্নর খেলা দেখে থাকবে। তবে তারা যেখানে-সেখানে খোলা জায়গায় নানারকম যাত্নর খেলার সঙ্গে ত্ন-একটি বৈজ্ঞানিক খেলাও দেখিয়ে থাকে। সেগুলিকেও তারা অবশ্য যাত্নবিদ্যা বলেই প্রকাশ করে। এখন তোমাদের কাছে এই রকমের একটা খেলার কথা বলছি।

যাত্নকর প্রথমে একটা কাচের গ্লাসের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ জলে ভর্তি করে গ্লাসের মুখে একটা ভিজা রুমাল ঢাকা দিয়ে দেয়। তারপর সেই রুমালের মাঝখানটা আঙ্গুল দিয়ে চেপে চেপে বাটির



মত একটা গর্ত করে। রুমালের মধ্যস্থল গ্লাসের জলের সঙ্গে লেগে গিয়ে বাটির মত গোলাকার হয়ে থাকে। এই অবস্থায় সে গ্লাসটাকে উল্টে নিয়ে তার ডান হাতের উপর রাখে। উল্টে দিলেও রুমালটা কিন্তু তখনও বাতাসের চাপে বেলুনের মত উপর দিকেই ফুলে থাকে।

এবার রুমালের ধারগুলি গ্লাসের গলার দিকে গুটিয়ে নিয়ে ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, ঠিক সেভাবে বাঁ-হাতে ধরে দর্শকদের বলে— যেই মাত্র আমি গ্লাসটার উপরে আঙ্গুল ঠেকাবো, যাদুবিদ্যার বলে তৎক্ষণাৎ গ্লাসের জল ফুটতে সুরু করবে।

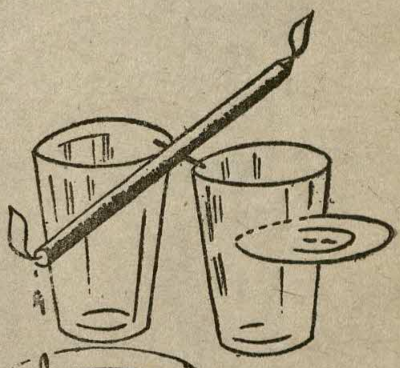
উত্তাপ প্রয়োগে জল ফোটবার পূর্ব মুহূর্তে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদ্ উঠতে দেখা যায়, এ ক্ষেত্রেও সে রকম বুদ্‌বুদ্ উঠতে থাকবে।

কেমন করে এটা হয়? ব্যাপারটা বিশেষ কিছুই নয়—গ্লাসের উপর আঙ্গুলের চাপ পড়বার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ-হাতে ধরা ভিজা রুমালটা গ্লাসের গায়ে পিছলে গিয়ে উপরের দিকে ওঠবার ফলে, অর্থাৎ গ্লাসটা ধরা জায়গার কিছুটা নীচে নামবার ফলে গ্লাসের মধ্যে আংশিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এর ফলে রুমালের সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্য দিয়ে বাতাস প্রবেশ করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদের সৃষ্টি করে। দেখে ঠিক জল ফোটবার মত মনে হয়।

স্বয়ংক্রিয় মোমবাতির খেলা

এপর্যন্ত তোমাদের অনেক রকম খেলনা যন্ত্র তৈরীর কথা বলেছি। তাদের মধ্যে কোন কোনটা তৈরী করতে হয়তো কিছুটা দক্ষতার প্রয়োজন; কিন্তু এখন তোমাদের এমন একটা স্বয়ংক্রিয় খেলনা তৈরীর কথা বলছি, যা তৈরী করা সবচেয়ে সহজ। ইচ্ছা করলে অল্প সময়ের মধ্যে খেলনাটা তৈরী করে পরীক্ষা করে দেখতে পারবে।

লম্বা একটা মোমবাতি সংগ্রহ কর। মোমবাতির সরু মুখটায় খানিকটা পল্‌তে বের করা থাকে। অপর দিকটা থাকে সমতল। সমতল দিকটার কিছুটা মোম ছুরি দিয়ে কেটে পল্‌তে বের করে দাও। এবার মোমবাতিটার মাঝামাঝি জায়গায় একটা সূঁচ বা ছোট্ট একটা লোহার সরু তার পাশাপাশিভাবে এ-ফোঁড়-ওফোঁড় করে ঢুকিয়ে দাও। সমান মাপের দুটো কাচের গ্লাস পাশাপাশি রেখে মোমবাতিতে বেঁধা সূঁচটাকে তাদের কানার উপর বসিয়ে দাও। মোম-বাতিটা এখন ঢেঁকিকলের



মত শয়ানভাবে অবস্থান করবে। যে কোন দিক থেকে একটু মোম কেটে নিলেই বাতির অপর দিকটা একটু ঝুলে পড়বে। এবার বাতিটার উভয় দিকের পলতে দুটোই জ্বেলে দাও। যে দিকটা নীচে ঝুলে আছে, সেই দিকটার মোম অপর দিকের মোমের চেয়ে কিছুটা বেশী পরিমাণে গলে নীচে পড়বে। তার ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই সেদিকটা হাল্কা হয়ে উপরে উঠে যাবে। তখন আবার অপর দিকের মোম বেশী পরিমাণে গলতে থাকবে। এভাবে বাতিটা যতক্ষণ পর্যন্ত নিঃশেষিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ওঠা-নামা করতে থাকবে।

ম্যাগ্ ডিবুর্গ গ্লাস

'ম্যাগ্ডিবুর্গ হেমিস্ফিয়ার' নামে একটি বিখ্যাত পরীক্ষার কথা অনেকেরই জানা আছে। এটি বাতাসের চাপের সাধারণ একটা পরীক্ষা মাত্র। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে জার্মেনীর ম্যাগ্ডিবুর্গে লৌহ-নির্মিত দুটি শূন্যগর্ভ অর্ধগোলকের সাহায্যে বায়ুচাপের এই পরীক্ষাটি করা হয়েছিল। অর্ধগোলক দুটিকে একত্রিত করে একটি গোলক তৈরী করবার পর অনায়াসেই আবার তাদের পৃথক করা যেত। কিন্তু গোলক তৈরী করে অভ্যন্তরস্থ বায়ু নিষ্কাশন করবার পর অর্ধগোলক দুটিকে পৃথক করবার জন্যে এক এক দিকে চারটি করে ঘোড়া জুড়ে টানতে হয়েছিল। এই হলো সেই বিখ্যাত ম্যাগ্ডিবুর্গ পরীক্ষা।



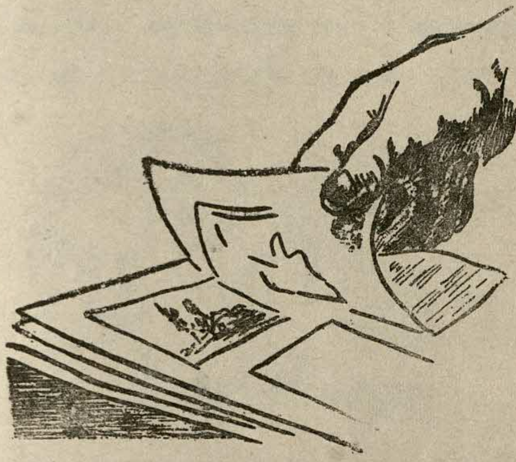
খুব ছোটভাবে এই পরীক্ষাটি তোমরাও করে দেখতে পার। একই মাপের দুটি কাচের গ্লাস এবং এক খণ্ড ব্লটিং পেপার সংগ্রহ কর। ব্লটিং পেপারখানা বেশ করে জলে ভিজিয়ে নাও। এক

সঙ্গে কয়েকটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে সেই জ্বলন্ত কাঠিগুলিকে একটি গ্লাসের মধ্যে ফেলে দিয়ে ভিজানো ব্লটিং পেপারখানা গ্লাসের মুখে চাপা দাও। এবার অপর গ্লাসটিকে উবুর করে ব্লটিং পেপারের উপর একটু চেপে বসিয়ে দাও। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখবে, ব্লটিং পেপার সমেত গ্লাস দুটি বেশ শক্তভাবে মুখে মুখে এঁটে বসে গেছে। উপরের গ্লাসটি টেনে তুললেই সঙ্গে সঙ্গে নীচের গ্লাসটিও উঠে আসবে।

ব্লটিং পেপার সচ্ছিদ্র হবার ফলে জ্বলন্ত কাঠিগুলি উপর ও নীচের উভয় গ্লাসের ভিতরকার অক্সিজেনই দহন করে ফেলবে। কাজেই ভিতরে চাপ হ্রাসের ফলে বাইরের বাতাসের প্রবলতর চাপ গ্লাস দুটিকে মুখে মুখে আট্‌কে রাখবে।

ছবি নকল করবার সহজ উপায়

খবরের কাগজ বা অন্যান্য কাগজে যে সব ছবি বা চিত্রাদি ছাপা হয়, সেগুলিকে সাদা কাগজে অথবা তোমাদের সাদা খাতায় খুব সহজেই নকল করতে পার। খবরের কাগজে ছাপা কোন ছবি যদি তুলতে চাও, তাহলে প্রথমে তরল পদার্থের একটা মিশ্রণ তৈরী করে নিতে হবে। এই মিশ্রণটি করতে কিছুটা তার্পিন (Turpentine) ও সাবানের দরকার হবে। চার ভাগ জলের



সঙ্গে একভাগ তার্পিন মিশ্রিত কর। পেন্সিলের মাথায় যেমন ছোট্ট এক টুক্‌রা রাবার লাগনো থাকে, ঠিক সেই রকম এক টুক্‌রা সবান

তার্পিন মিশ্রিত জলে ফেলে দাও। সাবানের টুক্‌রাটা জলে গলে না যাওয়া পর্যন্ত পাত্রটাকে বেশ করে ঝাঁকুনি দিতে থাক। মিশ্রণের জল ও তার্পিনের আপেক্ষিক গুরুত্ব বিভিন্ন; কাজেই যেন আলাদা না হয়ে যায় সেই জন্যে সাবান দেওয়া দরকার।

যে ছাপানো ছবি নকল করতে চাও, মিশ্রণে ভিজানো একখণ্ড ন্যাকড়া বা তুলা দিয়ে সেটাকে এবার আল্‌তোভাবে ভিজিয়ে নিয়ে তার উপর সাদা একখানা কাগজ চেপে বসাও এবং মসৃণ একটি বাটী বা চামচের পিঠ দিয়ে সাদা কাগজখানার উপর বেশ কয়েকবার জোরে জোরে ঘষে দিলেই দেখবে, কাগজের নীচের পিঠে ছবিটা অবিকল উঠে এসেছে—তবে ছবিটা উঠবে অবশ্য উল্টোভাবে। তার্পিন ছাপার কালিকে বেশ খানিকটা গলিয়ে নেয়, কাজেই ছবিটা ছাপা সাদা কাগজে উঠে আসে। ঘষবার সময় ভিজা ছবির কাগজটা যাতে ছিঁড়ে না যায়, সে জন্য তার উপর কয়েক শীট বাজে কাগজ চাপিয়ে দেওয়া দরকার।

ম্যাজিক কাচ

তোমার কোন বন্ধুকে তিন অঙ্কের যে কোন একটি সংখ্যা লিখতে বল। তবে মনে রাখতে হবে, সংখ্যাটির প্রথম ও তৃতীয় অঙ্ক দুইটির মধ্যে যেন অন্ততঃ ২-এর তফাৎ থাকে। তোমার বন্ধু অবশ্য না দেখিয়ে যে কোন সংখ্যা লিখবে এবং তোমার নির্দেশ মত যোগ-বিয়োগ করে যে ফল পাবে, সেটা তুমি এক অদ্ভুত উপায়ে তাকে জানিয়ে দিতে পার। ধর, সে লিখলো ৩১৭। এবার তাকে সংখ্যাটা উল্টে লিখতে বল। তাহলে সংখ্যাটা হবে ৭১৩। ৭১৩ থেকে ৩১৭



বিয়োগ দিতে বল। বিয়োগ ফল হবে ৩৯৬। এই বিয়োগ ফল ৩৯৬-কে আবার উল্টে দিতে বল। উল্টে দিয়ে পাওয়া যাবে ৬৯৩। এবার ৩৯৬ ও ৬৯৩ যোগ দিতে বল। যোগফল হবে ১০৮৯।

এই নিয়ম অনুসারে যে কোন সংখ্যা নিয়ে যোগ-বিয়োগ করলেই দেখবে, তার ফল হবে—১০৮৯।

তোমার বন্ধুকে খেলাটার কথা বলবার আগে ঘরের কোন একটা কাচের জানালার গায়ে সাবান জলে একটা আঙ্গুল ডুবিয়ে সেই আঙ্গুল দিয়ে ১০৮৯ সংখ্যাটা লিখে রাখ। কিছুক্ষণের মধ্যেই লেখাটা শুকিয়ে যাবে। জানালার কাচ পরিষ্কারই থাকবে।

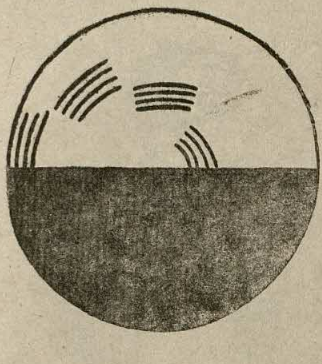
শেষ যোগফলটা বের করবার পর তোমার বন্ধুকে সেই নির্দিষ্ট জানালাটার কাছে গিয়ে কাচের উপর জোরে ফুঁ দিতে বল। বন্ধুটি দেখে অবাক হয়ে যাবে যে, কাচখানা কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে গেছে, কিন্তু তার মধ্যে তারই লিখিত অঙ্কের যথাযথ উত্তর ১০৮৯ সংখ্যাটি ফুটে উঠেছে। এর কারণ আর কিছুই নয়—সাবান জলে ডোবানো আঙ্গুল দিয়ে কাচের যে জায়গাটুকু স্পর্শ করা হয়—সেখানে কুয়াশা জমে না।

এই খেলাটা শীতকালেই ভাল দেখানো যায়। গরমের সময় ফুঁ দিলে কাচের গায়ে কুয়াশা জমবে না। তবে অবশ্য কৃত্রিম ব্যবস্থায় খেলাটা দেখানো যেতে পারে।

রং নেই তবুও রং দেখা

সাদা কাগজের একখানা গোলাকার চাকৃতির গায়ে কালিতে ধাপে ধাপে কতকগুলি বৃত্তাংশ এঁকে চোখের সামনে সেটাকে জোরে ঘোরাতে থাকলে বিভিন্ন উজ্জ্বল রঙের কতকগুলি বৃত্তাকার রেখা দেখা যাবে।

পরীক্ষাটা কিভাবে করতে হবে—বলছি। প্রথমে ছবিটা ভাল করে দেখে নাও। তারপর সাদা কাগজের উপর কালো কালি দিয়ে



কম্পাসের সাহায্যে একটি বৃত্ত এঁকে নাও। বৃত্তের অর্ধেকটা কালো করে দিতে হবে। সাদা দিকটায় ছবির মত করে পর পর ধাপে ধাপে কতকগুলি বৃত্তাংশ এঁকে কাগজখানাকে গোল করে কেটে নিয়ে কার্ডবোর্ডের একটা চাকৃতির উপর এঁটে দাও এবং চাকৃতিটার

মধ্যস্থলে একটা সরু ছিদ্র করে ছিদ্রের মধ্যে বেশ বড় একটা আলপিন ঢুকিয়ে দাও। এবার আলপিনটাকে ধরে চাক্তিখানাকে চোখের সামনে ঘোরাতে থাকলেই বিভিন্ন উজ্জ্বল রঙের কতকগুলি বৃত্তাকার রেখা দেখতে পাবে। উল্টোদিকে ঘোরালে বর্ণ-রেখাগুলির অবস্থানও উল্টে যাবে।

উনবিংশ শতাব্দীতে গুস্তব ফেক্‌নার নামে একজন জার্মান বিজ্ঞানী এই রকমের একটি চাক্‌তি তৈরী করে সর্বপ্রথম এই অদ্ভুত ব্যাপারটি লক্ষ্যকরেন। পদার্থ-বিজ্ঞানীরা একে বলেন Subjective colour। আজ পর্যন্ত তাঁরা এই ব্যাপারটির প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে একমত হতে পারেন নি।



একই ফুলে দু-রকম রং করবার কৌশল

ডাঁটাসমেত একটা সাদা কারনেশন ফুল (অন্য কোন সাদা ফুল হলেও চলবে) নিয়ে এসে ডাঁটার খানিকটা অবধি দুভাগে চিরে নাও। এবার দুটা গ্লাসে জল ভর্তি কর। একটা গ্লাসের জলে একটু লাল রং (খাবার জিনিষে যে রং ব্যবহার করা হয়) মিশিয়ে দাও। জলটা লাল হয়ে যাবে। এবার রঙীন জল ও পরিষ্কার জলের গ্লাস



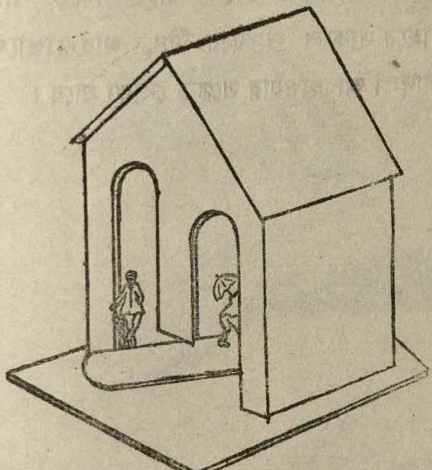
দুটাকে পাশাপাশি রেখে ফুলের চেরা ডাঁটার এক অংশ রঙীন জলে ও অপর অংশটাকে পরিষ্কার জলের মধ্যে বসিয়ে দাও। কেমন করে করতে হবে, ছবিটা দেখলেই বুঝতে পারবে। কয়েক ঘণ্টা পরেই

দেখতে পাবে, সাদা ফুলটার অর্ধেকটা সুন্দর হাল্কা লাল রঙে রঙীন হয়ে উঠেছে এবং অপর অর্ধেক সাদাই রয়ে গেছে।

ব্যাপারটা হলো এই যে, উদ্ভিদের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কৈশিক নলের মধ্য দিয়ে মাটি থেকে জল উপরে উঠে গিয়ে কাণ্ড, পাতা ও ফুলের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও কর্তিত স্থান দিয়ে তরল পদার্থ উপরে উঠে যায়। এই পরীক্ষা থেকে তোমরা উদ্ভিদের রস-শোষণের বিষয়টাও বুঝতে পারবে।

আবহাওয়া ঘর

আবহাওয়ার অবস্থা জানবার জন্যে তোমাদের কাছে একটি চিত্তাকর্ষক খেলনা তৈরীর কথা বলছি। খুব সহজেই তোমরা খেলনাটি তৈরী করতে পারবে। তৈরী করতে লাগবে—প্রায় বারো ইঞ্চি লম্বা কয়েক গাছা মানুষের মাথার চুল অথবা ঐ মাপে একখণ্ড সরু ক্যাটগাট, কিছুটা শিরিষের আঠা। খানিকটা কার্ডবোর্ড আর ছোট্ট দুটি প্লাষ্টিকের পুতুল—তাদের একটির হাতে থাকবে একটি বন্ধ-করা ছাতা, অপরটির মাথায় থাকবে খোলা ছাতা। চুল ব্যবহার করলে সেগুলিকে

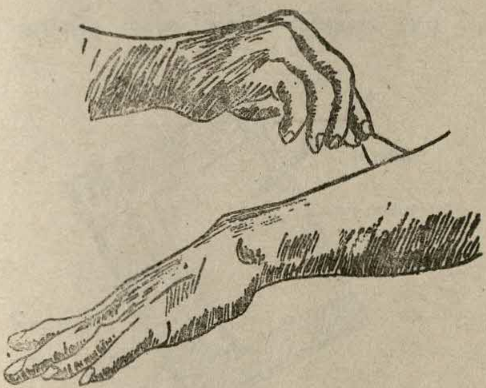


কষ্টিক সোডার হাল্‌কা দ্রবণের সাহায্যে পরিষ্কার করে নিতে হবে। কিন্তু ক্যাটগাট ব্যবহার করলে কিছু করবার দরকার নেই।

জিনিষগুলি সংগ্রহ করবার পর কার্ডবোর্ডটি কেটে শিরিষের আঠায় জুড়ে ছবির মত একটি ঘর তৈরী কর। দরজা দুটির পাশাপাশি দৈর্ঘ্যের কিছুটা ছোট একফালি কার্ডবোর্ডের দুই দিকে প্লাষ্টিকের পুতুল দুটি আঠার সাহায্যে দাঁড় করিয়ে দাও। চুল ক'গাছা মোচড় দিয়ে এক প্রস্থ সূতার মত করে নাও। এবার চুল অথবা ক্যাটগ্যাটের এক প্রান্ত পুতুল বসানো কার্ডবোর্ডের ঠিক মধ্যস্থলে এমন ভাবে এঁটে দাও, যাতে কার্ডবোর্ডের ফালিটা সমভূমিকভাবে ঝুলে থাকতে পারে। চুল অথবা ক্যাটগাটের অপর প্রান্ত ঘরের ভিতরের দিকে উপরের চালের সংযোগ-কোণের সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে। চুল এবং ক্যাটগাট উভয়েই জলাকর্ষী পদার্থ। কাজেই বাতাসে জলীয় বাষ্পের হ্রাস-বৃদ্ধি অনুযায়ী চুল বা ক্যাটগাটের মোচড়ের তারতম্য ঘটবে এবং তার সঙ্গে ঝুলানো কার্ডবোর্ডের ফালিটিও ঘুরে যাবে। তার ফলে একটি পুতুল ঘরের ভিতরে ঢুকে যাবে এবং অপরটি বেরিয়ে আসবে। দু'-একবার দেখে নিয়ে ক্যাটগাটের প্রান্তভাগ ঠিকমত চালে আট্‌কে দিতে পারবে। ছাতাবন্ধ পুতুলটি বাইরে থাকলে পরিষ্কার দিন, আর ছাতাখোলা পুতুলটি বাইরে এলেই বাদ্‌লা আবহাওয়ার সঙ্কেত বোঝা যাবে।

শরীরের স্পর্শানুভূতি

মেয়েদের চুলের কাঁটার দুটি বাহুর মধ্যে আধ ইঞ্চিরও কিছু কম ফাঁক থাকে। এরূপ একটি কাঁটার বাহু দুটিকে দু-দিকে টেনে ফাঁকটাকে দেড় ইঞ্চির মত বাড়িয়ে নাও। তোমার বন্ধুদের কাউকে চোখ বুজে তার হাতখানা বাড়িয়ে দিতে বল। এবার ফাঁক-করা চুলের কাঁটার দুটি মুখই একসঙ্গে তার অগ্র বাহুতে চেপে ধরে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা কর—সে একটা না দুটা কাঁটার স্পর্শ অনুভব করছে। আশ্চর্যের বিষয়—দেড় ইঞ্চি তফাতে দুটা কাঁটার স্পর্শকে তার একটা কাঁটার



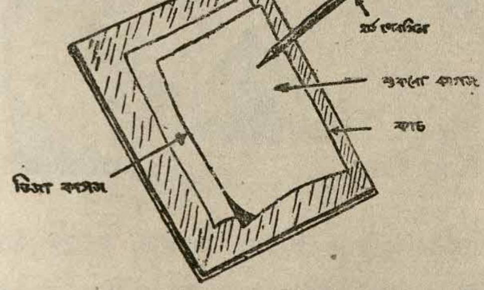
স্পর্শ বলেই মনে হবে; অর্থাৎ দুটি পৃথক স্থানের স্পর্শকে সে একটি স্থানের স্পর্শের মত অনুভব করবে।

এবার চুলের কাঁটার বাহু দুটাকে চেপে খুব কাছাকাছি করে

দাও—ফাঁকটা যেন এক ইঞ্চির ষোল ভাগের এক ভাগের মত হয়। এই ক্ষুদ্র ফাঁকের কাঁটাটাকে এবার বন্ধুর আঙ্গুলের ডগায় চেপে ঠিক পূর্বের মতই পরীক্ষা কর। এবার কিন্তু সে দুটি স্পর্শকেই পৃথকভাবে অনুভব করবে—একটি স্পর্শ বলে ভুল করবে না। আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশে স্পর্শানুভূতির অনেকটা পার্থক্য দেখা যায়। ইচ্ছা করলে তোমরা এই উপায়ে শরীরের বিভিন্ন অংশের স্পর্শানুভূতির পার্থক্য নির্ণয় করে একটা তালিকা প্রস্তুত করতে পার।

জলছাপের লেখা

তোমরা সবাই দেখে থাকবে নোট ষ্ট্যাম্প প্রভৃতির কাগজের গায়ে সনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে জলছাপ দেওয়া থাকে। সাধারণ ভাবে দেখলে কাগজে জলছাপের কোন চিহ্ন নজরে পড়ে না কিন্তু কাগজখানাকে জলে ডুবিয়ে বা ভিজিয়ে নিলে সেই ছাপ পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হয়। কাগজের উপর জোরে ছাপ দিয়ে জলছাপ তৈরী হয়ে থাকে। কাগজের যে সব জায়গায় জোরে চাপ পড়ে, সে সব জায়গার তন্তুগুলি বেশ চেপে বসে যায়। জলে ভিজিয়ে দিলে সে সব জায়গা থেকে প্রতিফলিত আলোর পথও কিছুটা পরিবর্তিত হয়। এই কারণেই

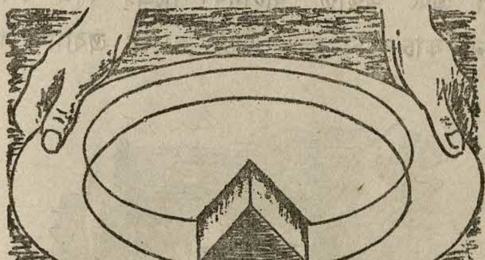


ভিজা কাগজে জলছাপ নজরে পড়ে থাকে। ইচ্ছা করলে তোমরাও খুব সহজেই জলছাপ দেবার কৌশল সাদা কাগজে লিখে গোপন সংবাদটি আদান-প্রদান করতে পার।

কৌশলটা খুবই সহজ। একখণ্ড সাদা কাগজ জলে ভিজিয়ে নিয়ে সেটাকে একখানা পরিষ্কার কাচ বা আয়নার উপর রাখ। এবার ভিজা কাগজখানার উপর আর একখানা শুক্‌নো কাগজ রেখে একটা হার্ড-পেন্সিলের সাহায্যে খুব চাপ দিয়ে তোমার বক্তব্য লেখ। এবার শুক্‌নো লেখা কাগজখানা সরিয়ে নাও, দেখবে—নীচের ভিজা কাগজটাতে তোমার লেখাগুলি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কাগজখানা শুকিয়ে গেলে তাতে লেখার কোন চিহ্নই দেখা যাবে না। কিন্তু কাগজটাকে আবার জলে ডুবিয়ে নিলেই লেখাগুলি পরিষ্কার দেখতে পাবে।

কেকের হারানো টুক্‌রো

চোখের ভুলের অনেক দৃষ্টান্তের কথা তোমরা শুনেছ। এবার দৃষ্টিবিভ্রমকারী আর একটা ছবি দিচ্ছি। চেষ্টা করে দেখো—এই রকম দৃষ্টিবিভ্রান্তিকর আর কোন ছবি আঁকতে পার কিনা। ছবিটি আঁকা হয়েছে যেন প্লেটের উপর একখানা কেক রাখা আছে এবং তার সামনের দিক থেকে তেকোনা একটু অংশ কেটে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু কেটে নেওয়া টুক্‌রাটা গেল কোথায়? বইখানাকে উল্টে ধরে দেখ,

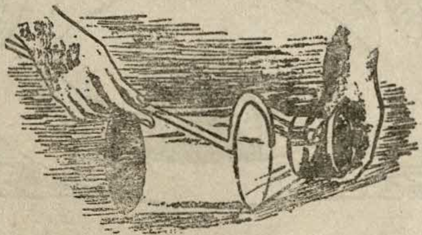


দেখবে টুক্‌রাটা হারিয়ে যায় নি ওখানেই আছে। টুক্‌রাটার সোজা কালো রেখাগুলির জন্যে সামনে থেকে খালি জায়গা বলেই মনে হবে, কিন্তু উল্টে দেখলে ওই রেখাগুলির জন্যেই সেটাকে আবার নীরেট টুক্‌রা বলে মনে হবে। অবস্থানভেদ অথবা দৃষ্টিকোণ পরিবর্তনের ফলে অনেক ব্যাপারে এই রকমের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে থাকে।

কাচের শিশি-বোতল কাটবার সহজ ব্যবস্থা

●

গৃহস্থালীর কাজে আমরা নানারকম কাচের শিশি-বোতল ব্যবহার করে থাকি। কানা বা গলা ভেঙে গেলে সেগুলি কোন কাজেই লাগে না। তাছাড়া অনেক সময় অব্যবহার্য শিশি-বোতল কোন কাজে লাগানো যায় না বলে কেবল জঞ্জালের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এসব শিশি-বোতল যদি গলা বাদ দিয়ে সমান করে কেটে নেওয়া যায়, তবে গেলাস এবং অন্যান্য মোটামুখ পাত্রের কাজ চলতে পারে। তোমরা জান, কাচ-কাটা কলম দিয়ে কাচের দ্রব্যাদি কাটা যায়;



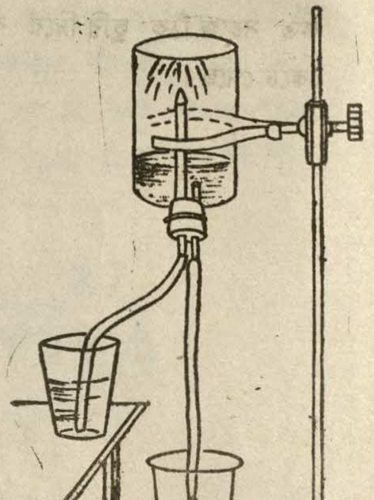
কিন্তু শিশি-বোতলের কাচ কাটতে গেলে বেশ দক্ষতার প্রয়োজন হয়। সেই জন্যেই অতি সহজ উপায়ে শিশি-বোতল ইত্যাদি কাটবার ব্যবস্থার কথা বলছি। এই ব্যবস্থায় তোমরা যে কেউ কাচের বোতল প্রভৃতি অনায়াসে কাটতে পারবে।

ফুটদেড়েক লম্বা একটা মোটা লোহার তার জোগাড় করে সেটার মাথার দিকটা অর্ধ-বৃত্তাকারে বাঁকিয়ে নাও। এটিই হবে বোতল কাটবার যন্ত্র। ধর, একটা বোতলকে গলার নীচে কেটে গেলাসের মত একটা পাত্র তৈরী করতে হবে। এজন্যে বোতলের যেখানটা কাটতে হবে, সেখানে সাধারণ একটা উখা বা রেতি দিয়ে সামান্য একটা দাগ কেটে নাও। উখাটাকে দু-চারবার ঘষ্‌লেই বোতলের গায়ে দাগ কেটে যাবে। এবার লোহার বাঁকানো দিকটা বেশ করে আগুনে পুড়িয়ে নিয়ে বোতলের ঘষ্‌ড়ানো দাগের উপর চেপে ধর এবং বোতলটাকে বাঁ-হাতে ধরে আস্তে আস্তে ঘুরাতে থাক। দেখবে, সঙ্গে সঙ্গেই বোতলটা সেই লাইনেই ফেটে গিয়ে পরিষ্কারভাবে দু-ভাগ হয়ে যাবে। যদি দেখ উত্তপ্ত তার বুলানোর সঙ্গে সঙ্গে বোতলে ফাটল ধরছে না, তবে ফুঁ দিয়ে অথবা এক ফোঁটা জল ফেলে একটু ঠাণ্ডা করলেই সঙ্গে সঙ্গে ফেটে যাবে। দেখবে, কত সহজে ঠিক ছুরি দিয়ে কাটার মত বেশ সমানভাবে বোতলটা কেটে গেছে।

সাইফন ফোয়ারা

এবার সাইফনের সাহায্যে একপ্রকার স্বয়ংক্রিয় ফোয়ারা তৈরীর কথা বলবো। সাধারণ কয়েকটা জিনিষ দিয়েই এই ফোয়ারা তৈরী করতে পারবে।

মোটা মুখের বেশ সাদা একটা কাচের বোতল যোগাড় কর। আর যোগাড় করতে হবে, বোতলের মুখের খাপমত একটা কর্ক, বা ছিপি, ৪ ইঞ্চি ও ২ ইঞ্চি লম্বা দুটি সরু কাচের নল এবং ছোট ও বড় দুটি রাবারের নল।



প্রথমে ছিপিটিতে কাচের নলের মাপমত দুটি ছিদ্র করতে হবে এবং ৪ ইঞ্চি লম্বা কাচের নলটার এক মুখ ড্রপারের মুখের মত সরু করে নিতে হবে।

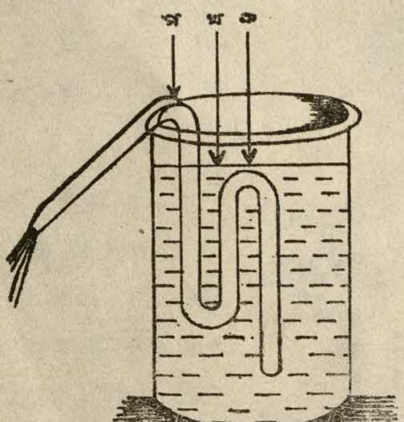
কাচের নল দুটিকে বেশ আঁট-ভাবে ছিপির ছিদ্রের মধ্যে এমন-ভাবে ঢুকিয়ে দাও যেন দুটি নলেরই আধ ইঞ্চি পরিমাণ অংশ ছিপিটার বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকে। ছোট কাচের নলটার বাইরে বেরিয়ে থাকা মুখে রাবারের বড় নলটা এঁটে দাও। আর বড় কাচের নলটার বাইরে বেরিয়ে থাকা মুখে ছোট রাবারের নলটা

লাগিয়ে দাও। বোতলের এক চতুর্থাংশ জল দিয়ে ভর্তি কর। এবার কাচের নল লাগানো ছিপিটাকে বোতলের মুখে এঁটে বসিয়ে দাও। টেবিলের উপর বড় একটা নাস ভর্তি জল রাখ।

এবার বোতলটাকে উল্টো করে, অর্থাৎ বোতলের তলার দিকটা উপরে আর মুখের দিকটা নীচের দিক করে টেবিলের চেয়ে উঁচু একটা ষ্ট্যাণ্ডের সঙ্গে এঁটে দিয়ে ছোট রাবারের নলটার সঙ্গে ড্রপারের মত সরু মুখের লম্বা কাচের নলটাকে জুড়ে দাও। খোলা মুখটা টেবিলের উপরে রাখা গ্লাসের জলের তলা অবধি ডুবিয়ে দাও। লম্বা রাবারের নলটার প্রান্তভাগ মেঝের উপর রাখা খালি পাত্রটার মধ্যে রাখতে হবে। দেখবে বড় নলটা দিয়ে বোতলের জল খালি পাত্রটার মধ্যে এসে জমা হচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে গ্লাসের জল কাচের সরু মুখ নলের ভিতর দিয়ে বোতলের খালি জায়গাটার মধ্যে ফোয়ারার মত ছিট্‌কে পড়ছে। গ্লাসের জল ফুরিয়ে গেলে আবার জল ভর্তি করে অথবা গ্লাসের পরিবর্তে বড় পাত্রে বেশী জল রেখে যতক্ষণ খুশী ফোয়ারা চালু রাখতে পার।

স্বয়ংক্রিয় সাইফন—১

এবার স্বয়ংক্রিয় সাইফনের কথা বলবো। ধর টেবিলের উপর এক গ্লাস জল রাখা আছে। গ্লাসটাকে কাৎ না করে সেই জল টেবিলের নীচে রক্ষিত পাত্রে কেমন করে আনা যায়? ইংরেজী U অক্ষরের মত ছোট-বড় করে বাঁকানো একটা কাচের নলে জল ভর্তি করে উল্টে নিয়ে বড় বাহুটা গ্লাসের জলের মধ্যে ডুবিয়ে দাও। দেখবে, অপর বাহুটা দিয়ে গ্লাসের জল নীচে নেমে আসছে। নলটাতে জল ভর্তি না করেও নলের বাইরের বাহুটাতে মুখ দিয়ে একটু বাতাস



টেনে নিলেও জল পড়তে থাকবে। কিন্তু এছাড়াও আর এক রকমের সাইফন তৈরী করা যায়, যাতে জল ভর্তি করবার বা মুখ

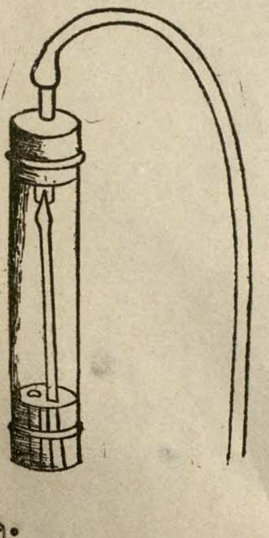
দিয়ে বাতাস টেনে নেবার প্রয়োজন হয় না, সাইফনটাকে গ্লাসের জলে বসিয়ে দেওয়া মাত্রই গ্লাসের সবটুকু জল আপনা-আপনিই নলের ভিতর দিয়ে নীচে নেমে আসবে।

ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, একটা লম্বা কাচের নলকে তেমনিভাবে তিন জায়গায় বাঁকিয়ে নাও। সেটাই হবে একটা স্বয়ংক্রিয় সাইফন। নলের সরু মুখটা গ্লাসের বাইরের দিকে রেখে সাইফনের বাকী অংশের সবটা গ্লাসে ডুবিয়ে দিলেই দেখবে গ্লাসের জল নলের সরু মুখটা দিয়ে ফোয়ারার মত সজোরে ছিট্‌কে বেরিয়ে আসছে।

কেন এমন হয়? সাইফনে ক-চিহ্নিত বাঁকটি জলে ডুবে যাওয়া মাত্রই গ্লাসের জল নলের বাঁক ঘুরে খ-চিহ্নিত জলতলের সমতা রক্ষার জন্যে নলের অপর দুটি বাহুতেই উপস্থিত হবে এবং ইনার্সিয়ার দরুণ আরও খানিকটা উঠে গিয়ে গ-চিহ্নিত বাঁক অতিক্রম করে সাইফন চালু করে দেবে। কাচের নল ছাড়া রাবার, প্লাষ্টিক বা অন্য কোন জিনিষের নল দিয়েও এরূপ সাইফন তৈরী করে পরীক্ষা করে দেখতে পার।

স্বয়ংক্রিয় সাইফন—২

এবার আর এক রকম সাইফনের কথা বলছি। প্রায় আড়াই সেন্টিমিটার ব্যাসের ৮ কি ১০ সেন্টিমিটার লম্বা দু-মুখ খোলা একটা প্লাষ্টিক অথবা কাচের চোঙ সংগ্রহ কর। এই চোঙের দু-মুখ এঁটে দেবার জন্যে দুটা কর্ক্‌ও যোগাড় করতে হবে। একটা কর্কের মধ্যস্থলে একটা ছিদ্র কর, অপর কর্ক্‌টাতে পাশাপাশি ছিদ্র করতে হবে। মাঝখানে ছিদ্র করা কর্ক্‌টার মধ্যে একটা কাচের নল ঢুকিয়ে দাও। দু-দিকের খানিকটা যেন কর্কের বাইরে বেরিয়ে থাকে।



এই কাচের নলের উপরের প্রান্তে বেশ লম্বা একটা রাবারের নল পরিয়ে দাও। এবার নল সমেত কর্ক্‌টিকে মোটা কাচের চোঙটার উপরের মুখে বেশ করে এঁটে বসিয়ে দাও। দুটি ছিদ্রযুক্ত কর্ক্‌টার একটা ছিদ্রের মধ্য দিয়ে পিপেটের মত সরু মুখের একটা কাচের নল এমনভাবে বসাও যেন সরু মুখটা উপরের কর্কের মধ্য দিয়ে বের-করা নলের কিছুটা ভিতরে ঢুকে যায়। এই কর্কের উপরের দিকটা যেমন আছে, তেমনই থাকবে।

এবার জল ভর্তি একটা বালতি টেবিলের উপর রাখ এবং কর্ক্ আঁটা চোঙটাকে বালতির জলের মধ্যে নামিয়ে দিলেই হবে। দেখবে, বালতির সবটুকু জল কাণার উপর দিয়ে রাবারের নলের সাহায্যে নীচে চলে আসবে। ছবিটা ভাল করে দেখে নাও—কি করতে হবে, সহজেই বুঝতে পারবে। ডুবিয়ে দেওয়া মাত্র সাইফনের কাজ আরম্ভ না হলে চোঙটাকে একটু নেড়েচেড়ে ঠিকভাবে বসিয়ে দিলেই হবে।



'করে দেখ'
গত কুড়ি বছর ধরে
বহু কিশোরকে বিজ্ঞানে আগ্রহী
করে তুলেছে এবং
ভবিষ্যতেও তুলবে। কারণ
"বিদ্যাসাগরের 'বর্ণ পরিচয়'-এর মত
বিজ্ঞান জগতে গোপালবাবুর লেখা
'করে দেখ'"।
'কলকাতার কড়চা'-র এই মন্তব্য
সম্পর্কে কেউই
দ্বিমত হবেন না।